দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

৭৬ বর্ষ, ২০ সংখ্যা ।। ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
২১ মাঘ, ১৪৩০ ।। যুগাব্দ - ৫১২৫
website : www.eswastika.com

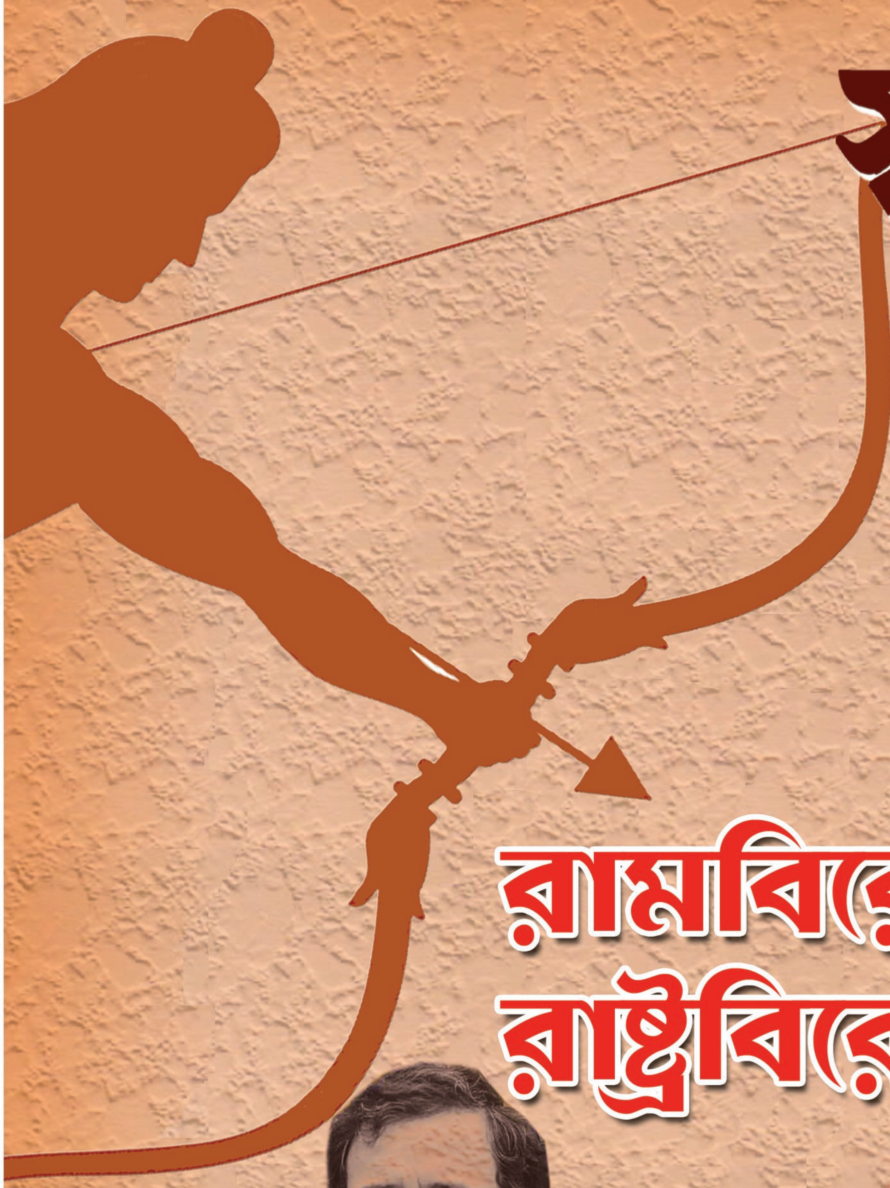

রামবিরোধীরা রাষ্ট্রবিরোধী

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE
NEW AGE PANELS

SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR

For any queries, **SMS 'PLY'** to **54646** or call us on **1800-2000-440** or give a missed call on **080-1000-5555**

E-mail: **kolkata@centuryply.com** | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: **www.centuryply.com**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক ।।

৭৬ বর্ষ ২০ সংখ্যা, ২১ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

৫ ফেব্রুয়ারি - ২০২৪, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

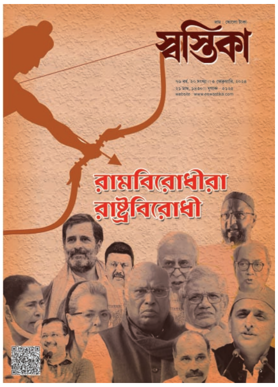

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ◻ ৫

মমতারাজ্যে কেন বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে? বিচারালয়-মাতুলালয়-রঙ্গালয় ◻ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ◻ ৬

নটে গাছটি মুড়োল ◻ সুন্দর মৌলিক ◻ ৭

সময়ের কেন্দ্রবিন্দু অযোধ্যা ◻ আর. জগন্নাথন ◻ ৮

ভারত-মালদ্বীপ সম্পর্কে জটিলতা বাড়াচ্ছে চীন
◻ বিশ্বামিত্র ◻ ১০

‘তৃতীয়বার মোদী সরকার, এবার চারশো পার’ আসন্ন নির্বাচনে পদ্মশিবিরের টার্গেট ◻ ধর্মানন্দ দেব ◻ ১১

দুষ্কৃতীদের অভয়ারণ্যে সাধুরা বিপন্ন
◻ মণীন্দ্রনাথ সাহা ◻ ১৩

শ্রীরামমন্দির উদ্বোধনে বিরোধীদের অনুপস্থিতি হিন্দু বিরোধিতার সিলমোহর ◻ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ◻ ১৫

অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দির এবং কিছু প্রশ্ন
◻ সুদীপনারায়ণ ঘোষ ◻ ১৭

মোদী বিরোধিতা থেকে রাষ্ট্রবিরোধিতা—রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠায় আজ উন্মোচিত একাধিক মুখোশ
◻ অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায় ◻ ২৩

হিন্দু বিরোধীরা শ্রীরামের জন্মস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন, ভারতের সর্বোচ্চ আদালত যোগ্য জবাব দিয়েছে
◻ বিনয়ভূষণ দাশ ◻ ২৬

মেদিনীপুরের রানি লক্ষ্মীবাই ◻ ড. অনিল কুমার ঘোষ ◻ ৩১

বঙ্গবিপ্লবের ‘সবুজ সার’ ভগিনী নিবেদিতা
◻ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ও ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায় ◻ ৩৩

শ্রীরাম বিরোধীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে
◻ আনন্দ মোহন দাস ◻ ৩৫

‘রামমন্দির ডাকটিকিট সংগ্রহ করার জন্য সমগ্র ভারতবাসীর তীব্র আকুলতা ◻ প্রদীপ মারিক ◻ ৩৭

মহেঞ্জোদড়ো কি মৃতের স্তূপ? ◻ ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার ◻ ৪৩

মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণ : উত্তর-পূর্ব ভারতে গ্রামীণ অর্থনীতির রূপান্তর ◻ অনিকেত বৈশ্য ◻ ৪৫

দেশের গরিবি হঠাতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ভূমিকা
◻ শেখর সেনগুপ্ত ◻ ৪৮

চট্টগ্রামের প্রাচীন তীর্থস্থান সীতাকুণ্ডকে দখলের চেষ্টা
◻ প্রকাশ দাস ◻ ৪৯

নিয়মিত বিভাগ :

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ◻ অঙ্গনা : ২১ ◻ সুস্বাস্থ্য : ২২ ◻ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ◻ রঙ্গম : ৩৯ ◻ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ◻ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৪৭ ◻ সংবাদ প্রতিবেদন : ৫০

ফঃ ১

প্রকাশিত হবে ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ১২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিদ্যার দেবী সরস্বতী

মা সরস্বতী বিদ্যার দেবী, প্রজ্ঞার দেবী। সরস্বতী পূজার দিন বিদ্যার্থীরা ব্রতী হয় দেবীর আরাধনায়। কিন্তু কয়েক বছর থেকে সরস্বতী পূজার দিনটিকে বাঙ্গালির ভ্যালেন্টাইন ডে বলে চালানো হচ্ছে। এটি পরিকল্পিতভাবে কচি-কাঁচা ছেলে-মেয়েদের মগজে একটা অপসংস্কৃতি ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা। ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা হচ্ছে সরস্বতী পূজার পবিত্রতাকে। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় এই বিষয়েই লিখবেন কয়েকজন বিশিষ্ট লেখক।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION

A/C. No. : **103502000100693**

IFSC Code : **IOBA0001035**

Bank Name :

INDIAN OVERSEAS BANK

Branch : **Sreemani Market Kolkata-700 006**

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**

Bank A/c --- 103502000100693

IFSC -- IOBA0001035

Bank -- Indian Overseas Bank

Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্র বিরোধী

পুনরায় প্রকট হইল দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির হিন্দু বিরোধিতা। গত ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় শ্রীরামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া প্রমাণ করিল তাহারা হিন্দু তথা হিন্দুধর্ম বিরোধী দল। হিন্দু বিরোধিতার নজির কংগ্রেস স্বাধীনতার বহু পূর্ব হইতেই রাখিতেছে। তাহারা দেশমাতৃকাকে খণ্ডিত করিয়াছে, রাষ্ট্রগীত বন্দেমাতরমকে খণ্ডিত করিয়াছে। কেরালায় দশ সহস্রাধিক হিন্দু হত্যাকারী এবং শত শত হিন্দু মাতা-ভগিনীর সম্ভ্রম হরণকারী মোপলা জিহাদিদিগকে দেশপ্রেমিক আখ্যা দিয়াছে। স্বাধীনতার পরও তাহাদের এইরূপ বহুবিধ কীর্তিকলাপের নজির রহিয়াছে যাহা হিন্দু ভাবাবেগকে প্রতিনিয়ত আহত করিয়াছে। তাহাদের নেতা তথা দেশের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সোমনাথ মন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বলিয়াছিলেন, সোমনাথের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় হিন্দুদিগের যে পুনরুত্থান শুরু হইবে তাহা তিনি মানিয়া লইতে পারিবেন না। আর তাহাদের দোসর কমিউনিস্টরা ভারতবর্ষে অত্যাচারী ইসলামের নৃশংসতা, বর্বরতা শুধু ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতেই দেখে নাই, ইতিহাস-পুস্তকেও তাহাতে শ্বেতপ্রলেপ করিয়া দিয়াছে। তাহার উপর তাহারা সমস্ত প্রকার ইসলামি অপকর্মের জন্য হিন্দুদিগকেই দায়ী করিয়াছে। হিন্দু বিরোধিতায় কংগ্রেস কমিউনিস্ট একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। কমিউনিস্টদের খুশি করিবার জন্যই ইন্দিরা গান্ধী সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'সেকুলার' ও 'স্যোসালিস্ট' শব্দ দুইটির অনুপ্রবেশ ঘটাইয়াছেন। এই শব্দ দুইটিকে হাতিয়ার করিয়া হিন্দু বিরোধিতাকে তাহারা আরও বলশালী করিয়াছেন। 'সেকুলার' শব্দের জোরে তাহারা বিধর্মীদের এই দেশে অবাধ ধর্মান্তরণের অধিকার প্রদান করিয়াছেন। পাঠান-মোগল-ইংরাজদিগের ন্যায় তাহারা পদে পদে হিন্দুদের অধিকার হরণ করিয়াছেন। ১৯৯০ সালে কাশ্মীরকে হিন্দুশূন্য হইতে দেখিয়াও নীরব থাকিয়াছেন। বিচ্ছিন্নতাবাদের মূল ৩৭০ ধারা বাতিলের বিরোধিতা করিয়াছে। ভারত এক দেশ, এক জাতি, এক প্রাণ হউক, ইহা তাহারা মানিয়া লইতে পারেন নাই। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, অধুনা তৃণমূল দেশবিরোধী শক্তিকে মদত দিয়া হিন্দু বিরোধিতায় মাতিয়া রহিয়াছে। শ্রীরামমন্দিরের বিরোধিতা তাহাদের হিন্দু বিরোধিতারই অঙ্গ।

কংগ্রেস, কমিউনিস্ট এবং তাহাদের সমগোত্রীয় দলগুলি ভারতবর্ষের রাষ্ট্রজীবনে মূলের সন্ধান কোনোদিন করে নাই। হিন্দুত্বই যে ভারতের রাষ্ট্রীয়ত্ব, তাহা তাহারা অনুধাবন করিতে পারে নাই। শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ যে ভারতের আত্মাস্বরূপ, তাহা সংবিধান প্রণেতাগণ অনুধাবন করিলেও ইহা তাহাদের বোধগম্য হয় নাই। ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনারও প্রারম্ভে শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের চিত্র দেশের আইন প্রণেতাদের রামরাজ্য ও ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দিতেছে, তাহা তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেই ইঙ্গিত অনুধাবন করিয়া ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন রামরাজ্য(সুশাসন) ও ধর্মরাজ্য(ন্যায়বিধান) প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হইতেছেন, তখন তাহার বিরোধিতায় ইহারা মাতিয়া উঠিয়াছেন। আসলে হিন্দু বিরোধিতা ইহাদের ডিএনএ-তেই রহিয়াছে। মোদী বিরোধিতা আর রাষ্ট্র বিরোধিতায় তাহারা ফারাক করিতে পারিতেছে না। দেশের মানুষ ইহাদের ভ্রষ্ট রাজনীতি ধরিয়া ফেলিয়াছেন। ধর্ম লইয়া কাহারা রাজনীতি করিতেছে, তাহাও পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে কাহারা মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। শ্রীরামমন্দিরের বিরোধিতা করিয়া আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবার পর দেশব্যাপী রামভক্তির জোয়ার প্রত্যক্ষ করিয়া কংগ্রেস কোথাও কোথাও তাহাদের দপ্তরের সম্মুখে হোর্ডিং লাগাইয়া প্রচার করিতেছে যে তাহাদেরই নেতা রাজীব গান্ধী সর্বপ্রথম রামমন্দিরের তালা খুলিয়া দিয়া হিন্দুদিগকে রামলালার পূজার অধিকার দিয়াছে। কিন্তু মানুষ তাহাদের ভণ্ডামি ধরিয়া ফেলিয়াছে। তাহারাই তো আদালতে এফিডেফিট দাখিল করিয়া শ্রীরামের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছে। তাহারাই তো শ্রীরাম কাল্পনিক বলিয়া রামসেতু ভাঙিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছে। শ্রীরামভক্তিতে সমগ্র দেশ উদ্বেল দেখিয়া তাহারা এই ভণ্ডামি শুরু করিয়াছে। দেশদ্রোহ ও ভণ্ডামি করিতে করিতে বামেরা নিশ্চিহ্ন হইতে চলিয়াছে, তবু তাহারা রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিন মানুষকে বিভ্রান্ত করিবার জন্য পদযাত্রা করিয়াছে। একটি বিষয় লক্ষণীয়, মোদী বিরোধী ইন্ডিজোটের নেতারা রামমন্দিরের বিরোধিতা দেশের কোথাও রাস্তায় নামিয়া প্রদর্শন করেন নাই। ব্যতিক্রম শুধু পশ্চিমবঙ্গের শাসক দল। তাহারা রাস্তায় নামিয়া বিরোধিতা করিয়াই শুধু ক্ষান্ত হয় নাই, শ্রীরাম সম্পর্কে কুকথাও প্রয়োগ করিয়াছে। অবশ্য এই মুহূর্তে পশ্চিমবঙ্গের শাসকদলের ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। দুর্নীতিতে তাহারা আপাদমস্তক নিমজ্জিত হইয়াছে। তাহা হইতে উদ্ধারের জন্যই তাহাদের এই রাষ্ট্র বিরোধিতা। সমগ্র বিশ্ব প্রত্যক্ষ করিতেছে, মোদীর নেতৃত্বে নূতন ভারত শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণকে পাথেয় করিয়া অগ্রসর হইতেছে। তাই তাহাদের বিরোধিতা ব্যতীত অন্য পথ নাই।

সুভাষিতম্

আয়ুষঃ খণ্ডমাদায় রবিরস্তময়ং গতঃ।
অহন্যহনি বোদ্ধব্যং কিমেতেৎ সুকৃতং কৃতম্।।
সূর্যাস্ত হলেই নিজের আয়ু একদিন কম হয়ে যাচ্ছে— একথা ভেবে প্রত্যেককে সারাদিনের সুকর্মের বিচার করা উচিত।

মমতা-রাজ্যে কেন বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে?

বিচারালয়-মাতুলালয়-রঙ্গালয়

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন 'রাম নীতি হ্যায়'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো নীতি নেই। তাই প্রয়োজনে দুর্নীতিকে কাজ লাগান। চার মাস আগেই ইন্ডিজোটের গঙ্গাযাত্রার ইঙ্গিত দিয়েছিলাম। মিলে যাওয়ায় ওটার চর্বিতচর্বণ করছি না। পশ্চিমবঙ্গে দুর্নীতির নতুন সমীকরণ চালু হয়েছে। তাতে আদালত যুক্ত হয়ে গিয়েছে। একে বলে মামার বাড়ির আবদার। রাজ্যের বিচারালয় এখন শাসকের মাতুলালয় আর রঙ্গালয়ে পরিণত হয়েছে। আদালতও তাদের ছল চাতুরির শিকার। সেখানে গুপ্ত আক্রমণ শুরু হয়েছে। গণতন্ত্রের প্রধানতম স্তম্ভ ন্যায়ালয়কে এখানকার শাসককুল যেরকম নগ্নভাবে প্রভাবিত করছে তাতে ধারণা হয় তারা গণতন্ত্র মানেন না। প্রকাশ্যে এই ধরনের লজ্জার ঘটনা এর আগে এ রাজ্যে ঘটেনি। যদিও লুকিয়ে ছুপিয়ে বহু কিছু ঘটেছে।

মমতা তার দল আর প্রশাসনকে আগেই নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন অন্যায় আর দুর্নীতি করার পর তার হাত থেকে বাঁচতে তারা যেন আদালতের সাহায্য নেন। নির্দেশটিতে মমতা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে শুধু স্তাবক উকিল নয় বিচারকদের মধ্যেও তিনি কিছু মাইনে করা সুবিধাভোগী ভৃত্য রেখেছেন যাঁরা লজ্জার মাথা খেয়েও তার দল, পরিবার আর প্রশাসনকে বাঁচাবে। সম্প্রতি দুই বিচারকের চুলোচুলি তার বড়ো প্রমাণ। এক বিচারক প্রকাশ্যেই তৃণমূলপন্থী। যে কোনোভাবে হোক দলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবমাননার হাত থেকে তিনি বাঁচাতে চান। তৃতীয় আর এক বিচারক তার বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ আদালতে সেই অভিযোগই জানিয়েছেন। যার সঙ্গে অভিযুক্ত বিচারকের চুলোচুলি, তিনি অতিবিপ্লবী। তাঁর অতি বিপ্লবীয়ানা একটি ক্ষেত্রে তাঁর সর্বনাশ ডেকে আনে। সর্বোচ্চ আদালত তাঁকে কড়া ধমক দেয়। ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে অন্য এক বিচারকের হাতে দিয়ে দেয়। মনে করিয়ে দেয় হাকিম হুকুমের দাস। হুকুম হাকিমের নয়। তাঁকে বিরত করা যায়নি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিকভাবে লড়তে গেলে চাতুরি আর কৌশল ব্যবহার করতে হয়।

গোঁয়ার্তুমি করা মূর্খামি। সময় আর সুযোগের অপেক্ষায় থাকতে হয়। চাণক্যবাণী বলে দুর্নীতি এমন অস্ত্র যা সব দিক দিয়েই কাটতে পারে। তাই যেদিকটা কাটতে কাটতে ভোঁতা হয়ে গিয়েছে সেদিক থেকেই শত্রুকে আক্রমণ করা দরকার। সেটা ওই বিচারকের ঘটে প্রবেশ করেনি। বহুক্ষেত্রে তাঁর তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত তার শত্রু হয়ে দেখা দেয় আর

> **আদালতকে প্রভাবিত করার ষড়যন্ত্র নতুন নয়। তবে তাকে মাতুলালয় বা রঙ্গালয় বানিয়ে ফেলাটাও সমীচীন নয়। শক্তিহীন শাসক তাই করে। তাই তার উচ্ছেদ প্রধান কর্তব্য।**

দুষ্কৃতীরা কিছুদিনের জন্য অক্সিজেন পেয়ে যায়। এই বোকামির জন্য আদালত সম্পর্কে জনমানসে নেতিবাচক ধারণা তৈরি হয়। এ রাজ্যের বিচারালয় একটা বড়ো ঠাট্টার বস্তুতে পরিণত হয়। এরপর রাজ্যের বীতশ্রদ্ধ মানুষ নিজের হাতে আইন তুলে নিলে অবাক হব না। এই অতি বিপ্লবী বিচারকের দুর্নীতি বিরোধী লড়াইকে আমি শ্রদ্ধা করি। কারণ সেই লড়াইয়ের পিছনে রয়েছে তাঁর নিষ্ঠা। তাকে আমি বাহবা দিই। বিচারকদের চুলোচুলি সর্বোচ্চ আদালতে পৌঁছেছে।

সেই রায় যাহোক না কেন তাতে যে রাজ্যের মুখ পুড়বে তাতে বিন্দুমাত্র লজ্জিত নন কেউ। পুলিশ বা প্রশাসনের উপর সাধারণ মানুষের আস্থা অনেকদিন আগেই উঠে গিয়েছে। আজ সেই অনাস্থার শিকার ন্যায়ালয় বা বিচারালয়। ভারতীয় দণ্ডনীতির আকর কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র আর কামন্দকীয় নীতি বলে প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি মার্গের সমন্বয়েই বেদোক্ত ধর্মের প্রতিষ্ঠা হয়। আদিকাব্য রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র দণ্ডনীতিশাস্ত্রের প্রবক্তা। তাই মোদী তাঁকে নীতি বলেছেন। রামায়ণে যে প্রকৃতিমণ্ডলের জ্ঞান রামচন্দ্র ভরতকে দিয়েছিলেন সেখানে সাত ধরনের শত্রুর কথা বলেছিলেন— সহজ, কৃত্রিম, প্রাকৃত, যাতব্য, উচ্ছেত্তব্য, পীড়নীয় ও কর্শনীয়। মমতা সেই উচ্ছেত্তব্য শত্রু। তার দুর্গাদি নেই। সে দুর্বল আর মিত্রহীন। ফলে চামড়া বাঁচানোর লড়াইয়ে মমতাবাহিনী যে কোনো মাত্রায় পৌঁছতে পারে। তারা আগেও অনেক বিচারককে হেনস্থা করেছে। আদালতকে প্রভাবিত করার ষড়যন্ত্র নতুন নয়। তবে তাকে মাতুলালয় বা রঙ্গালয় বানিয়ে ফেলাটাও সমীচীন নয়। শক্তিহীন শাসক তাই করে। তাই তার উচ্ছেদ প্রধান কর্তব্য। □

নটে গাছটি মুড়োল

একেলাষু দিদি,

এক হয়ে গেলেন নাকি একা হতে চেয়েছিলেন? আপনাকে বোঝা ভার দিদি! এতদিন ধরে আপনার অনুগত থেকেও আপনার মন বুঝতে পারি না সব সময়ে। আপনি ভালো নেই জানি। ভাইপোকে বাঁচানো যাবে না বুঝে গিয়েছেন। নিজেও বাঁচবেন কি না সে নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তবে আপনি আমার একটা কথা আগে শোনেনি বলে আমার রাগ হচ্ছে। আমার রাগ বা অনুরাগে আপনার কিছু যায় আসে না তবু বলছি, বাচ্চা জন্ম নেওয়ার আগেই নামকরণ ঠিক হয়নি। আপনি আগ বাড়িয়ে জোটের নাম দিলেন 'ইন্ডিয়া'। সে ব্যাটা তো মুখ থুবড়ে পড়েছে। যতই হোক আমাদের দেশের নাম তো। বিষয়টা ভালো লাগছে না।

নামকরণের ছ'মাসের মধ্যে এমন হাল হবে সেটা অবশ্য আমি ভাবিনি। আপনি বলছেন, আপনাকেই কেউ এখন আর পাত্তা দেয় না। জোটের অন্যতম মাথা রাহুল গান্ধীকে রাজ্যে থাকা, খাওয়ার জায়গা পর্যন্ত দিতে চাইছেন না। সব আসনে একলা লড়ার কথা বলে দিয়েছেন। এদিকে পঞ্জাবেও কংগ্রেসকে কোনও আসন ছাড়বে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন আপনার বন্ধু অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল আপ। এই পরিস্থিতিতে আমার ঠাকুরমার ঝুলির ওই লাইনটাই মনে পড়ছে— 'আমার কথা ফুরালো, নটে গাছটি মুড়োল'।

'ইন্ডিয়া' নামক মঞ্চটি লোকসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতেই তৈরি হয়েছে কিন্তু নির্বাচনের পরে তার অস্তিত্ব থাকবে কিনা, থাকলেও তার হাল কেমন হবে সে প্রশ্ন সবার মনেই ছিল। কিন্তু তার যে এমন মৃত্যু হবে সেটা হয় তো আমার মতো সবাই ভাবতেই পারেনি। জোটের প্রধান আহ্বায়ক নীতীশ কুমার সদলবলে বিজেপির ছাতার তলায় আশ্রয় নিয়েছে। বিলম্বিত বোধোদয় হলেও এখন তাঁর মন্ত্র— 'মোদীং শরণম্ গচ্ছামি'।

২০২৪ সালের প্রথম মাস পার হওয়ার সময়ে জোটের উত্তরকাণ্ড বা পরজন্ম বিষয়ক আলোচনা করা নিতান্তই অবান্তর। ভোট আসতে আর মাস তিনেক বাকি। সুতরাং বিরোধী দলের সমন্বয়মঞ্চটি তার বর্তমান জীবনের অর্ধেক মেয়াদ ইতিমধ্যেই কাটিয়ে ফেলেছে। এই সময়ে একটি কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, জন্মকালে বিশেষত অভাবিত নামকরণের মুহূর্তে, 'ইন্ডিয়া' যে ঢাকঢোল পিটিয়েছিল, আজ তার বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই। জোটের মৃত্যুর জন্য কংগ্রেসের ভূমিকা তো আছেই। আসলে রাজ্যে রাজ্যে কংগ্রেসের ব্যর্থতা এবং বিজেপির সাফল্য যখন লোকসভা নির্বাচনে বিরোধীদের কঠিন কাজকে আরও অনেক বেশি কঠিন করে তুলেছে। বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী এখন দেশের ১২টি রাজ্যে। আর জোট সরকার ৬টি-তে। এই সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে নতুন করে ইন্ডিয়া-কে জাগ্রত ও সচল করে তোলা আর সম্ভবই নয়। 'প্রধানমন্ত্রী পদে আমাদের প্রার্থী' হিসেবে কারও নামও বলতে পারেনি জোট। সবাই সবাইকে ল্যাং মারার খেলাটা বরং জমেছে। বড়ো গলায় বলা হয়েছিল, 'আমি নয়, আমরা' নামক বহুত্বের জয়গান গাইবে ইন্ডিয়া। কিন্তু দিদি, আপনার মতো সকলেই যে আমিত্বে বিশ্বাসী। আর আপনাদের হাতে সবার সহমত মেলার মতো একজন নরেন্দ্র মোদীও নেই। ফল যা হওয়ার তাই।

> **ভেবেছিলেন জোটে গিয়ে অন্য রাজ্যে প্রার্থী দিয়ে দলের সর্বভারতীয় তকমাটা যদি ফেরানো যায়। কিন্তু রামমন্দির নিয়ে দেশজুড়ে যে আলোড়ন তার পরে আপনি ঠিকই বুঝেছেন যে, কোনও রাজ্যেই বাড়তি ভোট আশা করা ঠিক নয়।**

কৌশলে আবার আপনি এগিয়ে। সহসা বিরোধী মঞ্চের 'মুখ' হিসেবে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের নাম প্রস্তাব করে বিভ্রান্তি তৈরি করে দিয়েছিলেন। এই প্রস্তাবের 'গূঢ় উদ্দেশ্য' কি সবাই বুঝেছিল? কংগ্রেসে তথা বিরোধী শিবিরে রাহুল গান্ধীর ভাবমূর্তিকে দুর্বল করে দেওয়া। ইন্ডিয়ার মধ্যে আহ্বায়ক নীতীশ কুমারের সম্ভাব্য ভূমিকাকে খাটো করে দেওয়া। এখন তো নীতীশ পলাতক। এবার কে পালাবে দিদি?

আপনার নাম তো আছেই সেই তালিকায়। বিজেপি আপনাকে নেবে না আপনি জানেন। আর মুসলমান ভোট পেতে আপনিও ওপথে যাবেন না। রামমন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরে বিহারের হাওয়া বুঝেছেন নীতীশ। পশ্চিমবঙ্গের হাওয়াও আপনি টের পাচ্ছেন। তাই একটা লড়াই ভালো। যদি কুড়িয়ে বাড়িয়ে কিছু আসন পাওয়া যায়। ভেবেছিলেন জোটে গিয়ে অন্য রাজ্যে প্রার্থী দিয়ে দলের সর্বভারতীয় তকমাটা যদি ফেরানো যায়। কিন্তু রামমন্দির নিয়ে দেশজুড়ে যে আলোড়ন তার পরে আপনি ঠিকই বুঝেছেন যে, কোনও রাজ্যেই বাড়তি ভোট আশা করা ঠিক নয়। আমি তাই বলি, আপনি বুদ্ধিমতীর মতোই কাজ করেছেন। হারলে নিজের রাজ্যে হারবেন। অতীতের মতো গোয়া, ত্রিপুরায় গিয়ে মুখ পোড়ানোর কী দরকার? □

অতিথি কলম

আর. জগন্নাথন

সময়ের কেন্দ্রবিন্দু অযোধ্যা

অযোধ্যা হতে চলেছে সভ্যতা-সংস্কৃতিগত মেলবন্ধনের সেই মূল সুর যা সম্প্রীতি-মৈত্রীর বন্ধনকে দৃঢ় করে সংঘটিত করবে সকল ধর্ম-সম্প্রদায়কে একত্রীকরণের সূত্রপাত।

ভারতীয়দের দ্বারা ভারতের পুনরাবিষ্কারের এবং হিন্দুদের দ্বারা হিন্দুত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গত ২২ জানুয়ারি অযোধ্যার বুকে নবনির্মিত রামমন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান ছিল এক উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। শাসক বিজেপি এই অনুষ্ঠানের রাজনীতীকরণ করেছে কি না বা বিরোধী দলগুলির তরফে এই অনুষ্ঠান বয়কট অপেক্ষা এই অর্জিত মাইলফলক অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতীয় মূলগত হিন্দুসত্তার পরিচিতির এই পুনঃপ্রতিষ্ঠা অযোধ্যার প্রেক্ষাপট অতিক্রম করে আরও বহুদূর বিস্তৃত। রামমন্দির নির্মাণ সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই বারাণসীতে রূপ পেয়েছে কাশী বিশ্বনাথ করিডোর, উজ্জয়িনীতে মহাকাল করিডোর এবং মথুরায় শ্রীকৃষ্ণজন্মভূমিকে কেন্দ্র করে হয়েছে একটি করিডোর প্রকল্পের সূচনা। উত্তর ও মধ্য ভারতের এই প্রকল্পগুলি ছাড়াও, অযোধ্যায় প্রাণ প্রতিষ্ঠার ৫ দিন আগে পুরীর জগন্নাথ ধামকে কেন্দ্র করে আবর্তিত অঞ্চলসমূহের উন্নয়নে 'শ্রী মন্দির পরিক্রমা প্রকল্পে'-র উদ্বোধন করেছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক। ভারতের দেবস্থান এবং সেই পবিত্র স্থানগুলিরপার্শ্ববর্তী এলাকাগুলির প্রচার-প্রসার ও পুনরুজ্জীবনের প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক উভয় প্রকার উদ্দেশ্য ও বিষয় ক্রিয়াশীল হলেও এই প্রকল্পসমূহ সভ্যতা-সংস্কৃতিগত পুনর্জাগরণের লক্ষ্যে একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অংশস্বরূপ। ২০১৪ থেকে এর সূত্রপাত হয়নি।

'৮০-র দশকে দূরদর্শনে সম্প্রচারিত রামানন্দ সাগর পরিচালিত 'রামায়ণ' ছিল হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুত্থানের প্রাথমিক ঝলক। লক্ষাধিক দর্শক দল বেঁধে বা সপরিবারে দেখতেন টেলিভিশনের পর্দায় সম্প্রচারিত রামায়ণ। তাদের সঙ্গে অংশ নিতেন বাড়িতে টিভি না থাকা প্রতিবেশীরাও। সেই সময় হিন্দু পরম্পরা ও ঐতিহ্য সম্পর্কিত ধ্যানধারণা পূর্বতন প্রজন্ম হতে পরবর্তী প্রজন্মে এইভাবেই প্রবাহিত হয়েছে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে 'ধর্মনিরপেক্ষ' দেশ গঠনের ছকে যা হয়েছিল স্তব্ধ। সেই সময়ের রামায়ণের দর্শক তরুণ, যুবক ও কৈশোরে পদার্পণকারীরা আজকের তরুণ ও কিশোরদের পিতা। আজকের এই নতুন প্রজন্মের কিশোররাও ঠিক ৪০ বছর আগের তাদের অভিভাবকদের মতোই অতীতের সঙ্গে মেলবন্ধনে, সংযোগ স্থাপনে আগ্রহী। অযোধ্যায় প্রতিদিন ঘটে চলা নানা বিষয়ে টিভি চ্যানেলগুলিতে সম্প্রচারিত লাইভ ধারাবিবরণী এই জেনারেশন জেড (বর্তমান প্রজন্ম)-এর মধ্যে ঘটিয়ে দিয়েছে জ্ঞান ও চেতনার এক অদ্ভুত প্রকাশ। ফলে তারা প্রাণপ্রতিষ্ঠা, গর্ভগৃহ, প্রায়শ্চিত্ত, কর্মকোটি পূজা ইত্যাদি বিষয়ে জানতে বিশেষ উৎসাহী। এ যেন সভ্যতা-সংস্কৃতিগত পুনর্জাগরণের সূত্রপাত। তরুণ প্রজন্মের আগ্রহ এখন অযোধ্যা সংক্রান্ত আপডেট সংবাদগুলিতে। বিভিন্ন বর্ণ-সম্প্রদায়ের লোকগাথার সংমিশ্রণের সঙ্গে রয়েছে রামায়ণের বিষয়সমূহের গভীর যোগসূত্রগত একাত্মতার অটুট বন্ধন। যা হয়তো অচিরেই হয়ে উঠবে সনাতন ধর্মের অন্তর্গত বিভিন্ন মত ও সম্প্রদায়ের প্রধান বক্তব্য বা মূল আন্তঃসম্প্রদায় সংলাপ।

নির্বাচনী উদ্দেশ্যে হিন্দুত্বের ব্যবহার, হিন্দুত্বের প্রচার-প্রসারের প্রসঙ্গে বলতে হয় যে রামমন্দির শুধুমাত্র একটিমাত্র মন্দির নয়। তার সঙ্গে রয়েছে জটায়ু, বাল্মীকি, শবরী, মহর্ষি বশিষ্ঠ, মহর্ষি বিশ্বামিত্রের মন্দির, যাঁরা শ্রীরামের সঙ্গে শুধু ওতপ্রোতভাবে যুক্ত নন, বিভিন্ন ভারতীয় গোষ্ঠী, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি স্বরূপ। রামায়ণের দিব্য আদর্শধর্মী আখ্যান ও চিন্তাধারার সঙ্গে বিভিন্ন জাতি ও জনজাতিদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে এটি একটি সুচিন্তিত প্রয়াস। উপাখ্যানধর্মী বর্ণনার মাধ্যমে বহু সহস্রাব্দ ধরে এভাবেই সংস্কারিত, বিবর্তিত হয়ে চলেছে কোনো প্রতিষ্ঠাতা বা সুনির্দিষ্ট মূল নীতি বা স্থির মতবাদহীন, সীমাবদ্ধতাহীন হিন্দুধর্ম। এই ধর্ম আধারিত দু'টি বৃহৎ মহাকাব্য— রামায়ণ-মহাভারত ও পৌরাণিক কাহিনিসমূহ সমগ্র উপমহাদেশের কল্পনালোকে যেন বিস্তার করেছে তাদের প্রভাব। বিভিন্ন প্রান্তের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরম্পরার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলেই যেন খুঁজে পায় তাদের স্থানীয় লোকগাথা ও কিংবদন্তী সমূহের সঙ্গে রামায়ণ-মহাভারত- পুরাণে বর্ণিত উপাখ্যানের যোগ। 'হিন্দুত্ব' কোনো দিনই শীর্ষ হতে নীচের স্তরে প্রবাহিত কোনো বক্তব্যধর্মী তত্ত্বরাজি নয়। কিন্তু যখনই কোনো বড়ো মাপের আখ্যান মনোলোককে করে প্রভাবিত, তখনই তার অনুরূপে স্থানীয় স্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে নানা উপাখ্যান অনবরত হতে থাকে রচিত। হিন্দুত্বের রাজনীতির ক্ষেত্রেও এই মূল নির্যাসটিই প্রযোজ্য।

মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির লক্ষ্যে বর্তমান ভারত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু প্রণীত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে পরিহার করে হিন্দু সাংস্কৃতিক ভাবধারার প্রতি ক্রমশ আকৃষ্ট হচ্ছে। বামমার্গী ও তথাকথিত উদারপন্থী অভিজাতশ্রেণীর অভিসন্ধিমূলক চিন্তাধারাপ্রসূত দেশগঠন প্রকল্পকে রূপদানের

জন্য নেহরুর আমলে রাজনৈতিক চাপে সাধারণ হিন্দু নাগরিকরা তাদের ধর্মীয় পরিচয় আংশিকভাবে অস্বীকার করতে, তাদের সাংস্কৃতিক পরিচয় ভুলে থাকতে বাধ্য হয়। কিন্তু সেই একই চিন্তাধারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তাদের ধর্মীয় নির্দেশ অনুসারে পোশাকপরিচ্ছদ, রীতিনীতি পালনে করে গিয়েছে উৎসাহিত। একদিন এই ভণ্ডামির শেষ হওয়া ছিল নিশ্চিত। অযোধ্যার বুকে সভ্যতা-সংস্কৃতির গরিমার বহিঃপ্রকাশ যেন সেই দিনটিরই সাক্ষ্য বহন করছে। যে প্রশ্নটি স্বঘোষিত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় হতে উঠে আসতে পারে সেটি হলো— হিন্দু পরিচিতি প্রতিষ্ঠার এই প্রকাশ আন্তঃসম্প্রদায় সম্পর্কে কী ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে? বিশেষ করে যখন একজন সাধারণ মুসলমানের কাছে তা এক ধরনের ক্ষোভ ও অস্বস্তির কারণ। এই ক্ষেত্রে পালটা এই প্রশ্নটিও করা বিশেষ যুক্তিযুক্ত যে ইসলামের মূর্তিপূজাবিরোধী, দেববিগ্রহধ্বংসকারী রূপটিকে উপেক্ষা করে, লুকিয়ে রেখে রচিত অপ্রীতিকর ও মনগড়া ইতিহাস কি ভারতের প্রধান দুইটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বোঝাপড়া ও মেলবন্ধনের প্রকৃত ভিত্তি হতে পারে? অসত্যের ভিত্তির উপর কি স্থাপিত হতে পারে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসের সম্পর্ক?

চিন্তাশীল, পরিণতমনস্ক মুসলমান সম্প্রদায় যদি অযোধ্যায় এই মন্দির নির্মাণের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হিন্দুদের মনোভাবের প্রকাশকে সদর্থক মানসিকতা বলে স্বীকার করতে পারে, তবে তাদের তরফে সৃষ্ট অসংখ্য মূর্তি ধ্বংসের ইতিহাস দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের হৃদয়ে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছে, সেই বিষয়ে আত্মসমীক্ষা হয়তো তাদের তরফেও বিশেষ প্রয়োজন।

অন্য একটি বিষয়ও উত্থাপিত হওয়া এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। ১৯৯০-'৯১-তে চন্দ্রশেখরের ক্ষণস্থায়ী সরকারের সময়ে কিছু সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী রামজন্মভূমি সম্পর্কে দুই পক্ষ একটি মীমাংসা বা বোঝাপড়ায় উপনীত হতে সম্মত হয়। কিন্তু বামপন্থী ইতিহাসবিদ্‌দের তরফে প্রকাশিত 'হিস্টোরিয়ানস্ রিপোর্ট টু দ্য নেশন' নামক কাল্পনিক তথ্য সংবলিত একটি দস্তাবেজ এই প্রক্রিয়ায় বাদ সাধে। খননকার্যের মাধ্যমে উঠে আসা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মতো গ্রহণযোগ্য প্রমাণকে নস্যাৎ করে এই রিপোর্টে দাবি করা হয় যে বিতর্কিত মসজিদের নীচে কোনো মন্দিরের অস্তিত্ব নেই। হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজনকারী শক্তিদের চেয়েও এই বামপন্থীরা এইভাবে তাদেরই বপন করা 'সেক্যুলারিজম'-এর ক্ষতি করেছে অনেক বেশি।

একটি প্রধান তীর্থস্থান রূপে অযোধ্যার এই পুনর্জন্ম এবং তার মাধ্যমে হিন্দুসমাজের মধ্যে সাংস্কৃতিক পুনঃপ্রতিষ্ঠার ধারাটিকে ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার নামে আর চেপে রাখা যাবে না। হিন্দুত্বের আদর্শ অনুযায়ী, ধর্মীয় ভাব ও আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে পার্থিব বিষয়বোধের কোনো ভেদ বা বিরোধ নেই। হিন্দুধর্মের চারটি পুরুষার্থ (অর্থাৎ, জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য) ধর্ম ও মোক্ষ ছাড়াও অর্থ (ধন-সম্পদ অর্জন) ও কাম (অর্থাৎ, নিজেদের আপন সীমার মধ্যে মানবিক ইচ্ছা পূরণ)-এর প্রতিও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। হিন্দু মতাদর্শ আধ্যাত্মিক ও বিষয় চেতনার মধ্যে কোনো বিভেদরেখা অঙ্কন করে না। একটিকে অন্যের বিপ্রতীপে বিশ্লেষণ করে না। কিন্তু এই তথাকথিত উদারপন্থী বামমার্গী চিন্তাধারা এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়ের পরিবর্তে ভয়াবহ মেরুকরণ ঘটিয়ে এমন একটি সংঘাত বা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে, ভারতীয় এতিহাসের প্রেক্ষিতে যার কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

কিছু বিষয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্‌বাণী করা যেতেই পারে। প্রথমত, অযোধ্যা আগামী দিনে হয়ে উঠতে চলেছে বিশ্বের বৃহত্তম তীর্থক্ষেত্র। বৃহত্তম তীর্থকেন্দ্র, হিন্দুত্বের প্রাণকেন্দ্র রূপে অযোধ্যার এই আত্মপ্রকাশের কৃতিত্ব বর্তায় অগণিত ধর্মপ্রাণ হিন্দুদের উপর যারা ধর্মীয় তীর্থযাত্রা ছাড়াও পর্যটন ইত্যাদি কারণে অযোধ্যাকে তাদের গন্তব্যস্থল হিসেবে বেছে নিতে চলেছেন। দ্বিতীয়ত, গোল্ডেন ট্যুরিস্ট সার্কিট বা পর্যটকদের একান্ত পছন্দের ভ্রমণকেন্দ্র রূপে পরিচিত দিল্লি-আগ্রা-ফতেপুর সিক্রিকে এবার নিশ্চিতভাবে টেক্কা দিতে চলেছে অযোধ্যা-কাশী-প্রয়াগরাজ ও মথুরা সমন্বিত কোয়াড্রা-সার্কিট বা চতুর্ভুজাকৃতি পর্যটন প্রকল্প। উত্তরপ্রদেশ একদা ভারতের পিছিয়ে পড়া একটি রাজ্য হিসেবে পরিগণিত হলেও ধর্মীয় পর্যটনের মাধ্যমে প্রভূত অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে রাজ্য জুড়ে বাস্তবায়িত হতে চলেছে রাস্তাঘাট, রেল যোগাযোগ, বিমানবন্দর, হোটেল, স্কুল ও হাসপাতালের মতো স্থায়ী ও অস্থায়ী পরিকাঠামো ও পরিষেবা।

সময় হয়েছে যারা একদা ওই বিতর্কিত জমিতে স্কুল স্থাপন বা হাসপাতাল নির্মাণের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। যেখানে নিজস্ব সম্পদ সৃষ্টিতে সক্ষম একটি পবিত্র দেবস্থানকে কেন্দ্র করে এইরকম একাধিক স্থায়ী পরিকাঠামো গড়ে ওঠা সম্ভব, সেখানে বিতর্কিত স্থানে নির্মিত একটি বিদ্যালয়ে হিন্দু বা মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের ভর্তি হওয়া কতটা যুক্তিযুক্ত? অর্থনৈতিক পুনর্গঠন ও পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া এই অঞ্চলটির উন্নয়নে সহায়ক হতে চলেছে আজকের এই অযোধ্যা, যেখানে হিন্দু ও মুসলমান, উভয় সম্প্রদায়ের বাস। অযোধ্যা হতে চলেছে সভ্যতা-সংস্কৃতিগত মেলবন্ধনের সেই মূল সুর যা সম্প্রীতি-মৈত্রীর বন্ধনকে দৃঢ় করে সংঘটিত করবে সকল ধর্ম-সম্প্রদায়কে একত্রীকরণের সূত্রপাত। সভ্যতা-সংস্কৃতির এই মলিন বেশ ত্যাগ করে, রামমন্দিরের এই নবনির্মাণের মাধ্যমে হিন্দুধর্মের এই উত্থান, হিন্দুত্বের এই অভূতপূর্ব জাগরণ সকলের মনে যেন করে চলেছে সেই প্রত্যাশারই সঞ্চার। □

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন। নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম- ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

ভারত-মালদ্বীপ সম্পর্কে জটিলতা বাড়াচ্ছে চীন

বিশ্বামিত্র

ক্রমশ জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে ভারত-মালদ্বীপ সম্পর্কের রসায়ন, আর তার সুযোগ নিচ্ছে চীন। সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর লাক্ষাদ্বীপ সফর ঘিরে মালদ্বীপের সরকারি কর্মকর্তা ও মন্ত্রীদের অপমানজনক মন্তব্য এবং ভারতীয় সেনাদের মালদ্বীপ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য সেদেশের প্রশাসনের চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া নিয়ে দু'দেশের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। ভারতজুড়ে চলছে মালদ্বীপে ভ্রমণ বয়কটের ডাক। প্রসঙ্গত, ভারত মহাসাগরের ক্ষুদ্র দ্বীপদেশ মালদ্বীপের ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে ভারত ও চীনের মধ্যে। সম্প্রতি এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই ভারতকে মালদ্বীপে অবস্থানরত তাদের প্রায় ৮০ জন সেনাকে প্রত্যাহার করে নিতে ১৫ মার্চ পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে মালদ্বীপের রাজধানী মালে। এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মধ্যেই ভারতের উদ্বেগ বাড়িয়ে সিয়াং ইয়াং হং-০৩ নামের এই জাহাজ ভারত মহাসাগর অঞ্চলে ঢুকছে। জাহাজটির গন্তব্য, মালদ্বীপের রাজধানী মালে। এই খবর মাইক্রো ব্লগিং সাইট এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে জানিয়েছেন গোয়েন্দা বিশেষজ্ঞ ড্যামিয়েন সায়মন। অনুমান করা হচ্ছে যে, জাহাজটি ভারত মহাসাগর অঞ্চলে জরিপ অভিযান চালাবে। আর এটাই চাপে রেখেছে ভারতকে। ভারতের এক সামরিক আধিকারিক সায়মনের এই বক্তব্য নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, তাঁরা জাহাজটির গতিবিধি নজরে রাখছেন। চীনের সমুদ্র-গবেষণা জাহাজকে বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছে মালদ্বীপও। ফলে ভারতের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক আরও তলানিতে যাওয়ার আশঙ্কা।

ঘটনা হলো, গত ২৩ জানুয়ারি মালদ্বীপের সরকার ঘোষণ করেছে, চীনের সমুদ্র-গবেষণা সংক্রান্ত জাহাজ শিয়াং ইয়াং হং ০৩-কে তাদের বন্দর ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মালদ্বীপের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে, চীনের জাহাজটি তাদের দেশে আসছে। তবে কবে আসবে, তা নির্দিষ্ট করে বলেনি।

জানা গিয়েছে, জাহাজটিকে তাদের বন্দর ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া নিয়ে বেজিঙের কাছ থেকে কূটনৈতিক স্তরে অনুরোধ পেয়েছিল মালে। সে দেশের সরকারি সূত্র বলছে, ওই জাহাজটি তাদের বন্দরে আসবে, পুরনোদের বদলে নতুন কর্মীরা জাহাজে যাবে। জাহাজে মালপত্র তোলা হবে। তারপর তারা আবার সমুদ্রে ফিরে যাবে। মালদ্বীপের জলসীমায় তারা কোনো গবেষণার কাজ করবে না।

দেশটির বিদেশমন্ত্রক বিবৃতি দিয়ে আরও জানিয়েছে, মালদ্বীপ সবসময় বন্ধুদেশের জাহাজকে স্বাগত জানায়। সামরিক ও অসামরিক জাহাজ আসার ক্ষেত্রে তাদের কোনো আপত্তি নেই। তবে শান্তিপূর্ণ কাজে তাদের বন্দর ব্যবহার করতে হবে। ভারত ইতিপূর্বে জানিয়েছিল, ভারত মহাসাগরে চীনের কোনো জাহাজকে যেন অনুমতি দেওয়া না হয়। তবে এই প্রতিবেদন লেখার সময় অবধি, মালদ্বীপের এই সিদ্ধান্তের পর ভারত কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।

যদিও দিল্লি সমসময় মনে করছে, মালদ্বীপ তাদের প্রভাবক্ষেত্র, কিন্তু এখন বেজিং এই ক্ষেত্রে ভারতকে চ্যালেঞ্জ জানানোয় সমস্যা বেড়েছে বলে আন্তর্জাতিক কূটনীতিকদের অভিমত। দিল্লি মনে করে, ভারত মহাসাগরের শান্তি ও স্থিতাবস্থা বিঘ্নিত করতে চাইছে চীন। ভারতের সন্দেহ, চীন মুখে সমুদ্র-গবেষণার কথা বলছে, আসলে তারা একটি সামরিক জাহাজ পাঠাচ্ছে। তাদের মূল উদ্দেশ্য হলো চরবৃত্তি ও সামরিক কার্যকলাপ চালানো। বেজিং যদিও বলেছে, তাদের এই জাহাজ কারও কাছে বিপদের কারণ হবে না।

> **'ভারত খেদাও' প্রচার চালিয়ে নভেম্বরে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট পদে চীনপন্থী মোহাম্মদ মুইজ্জু আসীন হওয়ার পর থেকেই মালদ্বীপের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক খারাপ হয়েছে।**

অথচ মালদ্বীপের প্রশাসন সমুদ্র-গবেষণার কথা বেমালুম অস্বীকার করে লোক আনা-নেওয়ার তত্ত্ব খাড়া করছে। দু'দেশের এই দু'রকম কথা আসল উদ্দেশ্যকে ধোঁয়াশা তৈরি করছে বলেই মনে করা হচ্ছে। ভারত তাদের উপকূলের কাছে এ ধরনের জাহাজগুলোকে সমস্যাসৃষ্টিকারী হিসেবেই বরাবর দেখে আসছে। এই জাহাজগুলো সামরিক জাহাজ নয়। তবে এসব জাহাজের গবেষণা সামরিক কাজে ব্যবহার করা হতে পারে বলে ভারত আশঙ্কা প্রকাশ করেছে।

২০১৯ সালে ভারত চীনের আরেকটি গবেষণা-জাহাজ তাদের এক্সক্লুসিভ ইকোনোমিক জোন (ইইজেড) থেকে বহিষ্কার করেছিল বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করার কারণে। ভারতের এক উচ্চপদস্থ নিরাপত্তা আধিকারিকের বক্তব্য, চীনের গবেষণা-জাহাজগুলো দ্বৈত ভূমিকা পালন করে। এসব জাহাজ বিস্তৃত গবেষণা করে যেসব তথ্য আহরণ করে, সেগুলো সামরিক-বেসামরিক উভয় উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। ভারত মহাসাগরে সাবমেরিন মোতায়েনেও এসব জাহাজ ভূমিকা পালন করতে পারে। 'ভারত খেদাও' প্রচার চালিয়ে নভেম্বরে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট পদে চীনপন্থী মোহাম্মদ মুইজ্জু আসীন হওয়ার পর থেকেই মালদ্বীপের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক খারাপ হয়েছে। বেইজিংপন্থী রাজনীতিবিদ মুইজ্জু মালদ্বীপ থেকে ভারতকে বের করে দেওয়ার কথাও বলেছেন। তিনি সম্প্রতি চীনে গিয়ে সেদেশের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিঙের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বলে সূত্রের খবর। সব মিলিয়ে ভারত-মালদ্বীপ সম্পর্কে মাথা গলিয়ে ভারত মহাসাগরকে ফের উত্তপ্ত করছে চীন।

‘তৃতীয়বার মোদী সরকার, এবার চারশো পার’

আসন্ন নির্বাচনে পদ্মশিবিরের টার্গেট

ধর্মানন্দ দেব

দোরগোড়ায় কড়া নাড়ছে লোকসভা নির্বাচন। আর মাত্র কয়েকমাস পরই শুরু হবে মহারণ। তার আগে কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে। শাসক থেকে বিরোধী সমস্ত দলই। আঞ্চলিক দলগুলোও প্রচারে ঝড় তোলার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে।

২০১৪ সালে ‘অবকি বার মোদী সরকার’ স্লোগান নিয়ে ভোটযুদ্ধে নেমেছিল বিজেপি। এককভাবে দল ২৮৩ আসনে জেতে এবং প্রধানমন্ত্রী হন নরেন্দ্র মোদী। এর পরে ২০১৯ সালে দলের স্লোগান ছিল, ‘ফির একবার মোদী সরকার’। বিজেপি জয় পায় ৩০৩ আসনে। সেই দুই স্লোগানের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে এবং ৪০০ আসনের লক্ষ্য সামনে রেখেই তৈরি হয়েছে এবারের স্লোগান।

শুধু স্লোগান নয়, সেই লক্ষ্যকে মাথায় রেখে নতুন বছরের একেবারে গোড়া থেকেই লোকসভা নির্বাচনের প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে শীর্ষ বিজেপি নেতৃত্ব। ৪০০ আসনকে মাথায় রেখে স্লোগান ঠিক করা হয়েছে, ‘তিসরি বার মোদী সরকার, অব কি বার চারশো পার।’ যার অর্থ, ‘তৃতীয় বার মোদী সরকার, এবার চারশো পার।’

এর আগে লোকসভা নির্বাচনে এক দলেরই চারশো আসন পেরনোর নজির রয়েছে। ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যুর পর, ১৯৮৪ সালের লোকসভা ভোটে রাজীব গান্ধীর নেতৃত্বে ৪০৪টিতে জয়ী হয়েছিল কংগ্রেস। এখন পর্যন্ত ভারতে লোকসভা ভোটের ইতিহাসে সেটাই রেকর্ড। তার পিছনে কারণ ছিল আততায়ীদের হাতে ইন্দিরা গান্ধীর মৃত্যু। সেই সময় ইন্দিরা গান্ধীকে হত্যায় সহানুভূতির হাওয়া কংগ্রেসের পালে বাড়তি অক্সিজেন দিয়েছিল বলা যায়। তখন প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন ইন্দিরা-পুত্র রাজীব গান্ধী। সেবার রাজীবকে মুখ করেই লোকসভা নির্বাচনে লড়েছিল কংগ্রেস। ১৯৮৪ সালে বিজেপি জিতেছিল মাত্র দুটি আসনে। দুই সংখ্যার আসন পেয়েছিল তিনটি দল— তেলুগু দেশম পার্টি (৩০), সিপিএম (২২) এবং এআইএডিএমকে (১২)। ১৯৫৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ৪৯৪টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস জিতেছিল ৩৭১টি আসনে। ১৯৮৯ সালে রাজীব সরকারের পতনের পর শুরু হয় ‘কোয়ালিশন’ বা পাঁচমিশালি সরকারের অধ্যায়। ১৯৯১

> টানা ১০ বছর ক্ষমতায় থাকার পরও নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা এখনও অটুট। লোকসভা হোক কিংবা বিধানসভা, এখনও তিনিই বিজেপির মুখ। সেটাই বিজেপির সব থেকে বড়ো শক্তি।

সালে তৈরি হলো চরম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থা এবং তার থেকে চরম অর্থনৈতিক সংকট। নরসিমা রাও সরকারের পক্ষে অর্থনৈতিক উদারীকরণ ছাড়া আর কোনও রাস্তা ছিল না, যা এখন ইতিহাস। ১৯৮৯ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত ভারত প্রধানত জোট সরকার পেয়েছে, কোনও রাজনৈতিক দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। ফলে প্রায় সব সরকারই ছিল কিছুটা নড়বড়ে। ২০১৪ সালে প্রথম নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি ২৮২টি আসন পেয়ে একক দল হিসেবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় এবং প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে ভারত আবার একটি শক্তপোক্ত স্থায়ী সরকার পায়।

নিবন্ধের প্রারম্ভে যে কথাটি বলেছিলাম ২০১৪ ও ২০১৯ সালের স্লোগানের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে তৈরি হয়েছে এবারের স্লোগান। কিন্তু ২০১৯ ও ২০২৪-এর মধ্যে যেটুকু বদল হয়েছে তা হলো অন্তত দুটি প্রধান রাজ্য, মহারাষ্ট্র ও বিহার, ‘যুদ্ধক্ষেত্রে’ পরিণত হয়েছে। এখানে মিত্রদের নিয়ে বিজেপির অবস্থান খুব একটা ভালো ছিল না। তাছাড়া আরও তিনটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক ও তেলেঙ্গানায় বিজেপিকে আগের থেকে এখন অনেকটাই দুর্বল বলা যায়। আবার উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হিমাচল, উত্তরাখণ্ড, দিল্লি, ছত্তিশগড়, কর্ণাটক ও ঝাড়খণ্ডে বিজেপি ২০১৯-এর নির্বাচনে সবচেয়ে বেশি আসন পায়। ২০১৯ সালে বিজেপি এই রাজ্যগুলিতে মোট ২৩৯টি আসনের মধ্যে ২১৪টি জিতেছিল। এরপর রয়েছে মহারাষ্ট্র, বিহার ও অসম। এখানে বিজেপি ১০২টি আসনের মধ্যে ৮৯টি আসন পায়। এছাড়াও কম আসনের রাজ্যগুলি হলো

ফঃ ২

পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, জম্মু ও কাশ্মীর, তেলেঙ্গানা ও গোয়া। এখানে বিজেপি তার মিত্রদের সঙ্গে ২০১৯ সালে ৮৮টি আসনের মধ্যে ৩৪টি জিতেছিল। এবার কি বিজেপি এই সংখ্যা ধরে রাখতে পারবে?

২০১৪ সালে বিজেপি পেয়েছিল ৩১ শতাংশ ভোট। সেবার বিজেপি একাই দখল করেছিল ২৮২টি আসন। ২০১৯ সালে বিজেপির ঝুলিতে প্রায় ৩৮ শতাংশ ভোট আসে। তখন ৩০৩ আসন জেতে এনডিএ জোট। ২০২৪-এ সব রেকর্ড ছাপিয়ে যেতে তৈরি বিজেপি। সেই লক্ষ্যেই স্ট্র্যাটেজি তৈরি হচ্ছে একের পর এক। তাদের বক্তব্য, বিরোধীরা যা খুশি জোট করুন। বিজেপিকে গোটা দেশে পেতে হবে ৫০ শতাংশ ভোট। যদি তা বাস্তবে সত্যি হয় তবে সেটা সাম্প্রতিক রাজনীতিতে বেনজির হবে। ক্ষমতায় ফেরার হ্যাটট্রিক করবে বিজেপি, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। তাদের হাতে আছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অন্যদিকে, 'ইন্ডি' জোট নানা কারণে জমাট বাঁধতে পারছে না। ইতিমধ্যে নীতিশ কুমার জোট পরিত্যাগ করেছেন।

বিরোধী দলগুলির নীতিহীনতা ও অহংকার এজন্য মূলত দায়ী।নবর্নির্মিত রামমন্দির উদ্বোধনের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করায় ইন্ডি জোট এখন আরও ব্যাকফুটে চলে গিয়েছে। রামমন্দিরের উদ্বোধনকে ঘিরে যে আবেগ বিজেপি ও হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলো তিল তিল করে গড়ে তুলছে, এছাড়াও শক্তিশালী দলীয় পরিকাঠামো ও উন্নতধরনের বিপণন কৌশল এবং ওবিসি ভোটারদের আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে বিজেপির সাফল্য চোখধাঁধানো। তারা যে সমাজের প্রান্তিক সম্প্রদায়ের ভোট পেতে চায়, তা জনজাতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি করার মধ্য দিয়েই বুঝিয়ে দিয়েছিল বিজেপি। এর আগে 'দলিত' রামনাথ কোবিন্দকে ওই সাংবিধানিক পদে বসিয়েছিল বিজেপি। বার বার বিজেপি এই বার্তাই দিতে চেয়েছে যে, তারা দেশের প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে আছে। এর পিছনে রাজনৈতিক যুক্তিও রয়েছে। প্রথমত, এই শ্রেণীর মানুষের ভোটদানের হার বেশি। ২০১৯ সালের 'লোকনীতি সিএসডিএস' -এর সমীক্ষা বলছে, ভারতে গড়ে ভোট পড়ে ৬২ শতাংশ। সেখানে জনজাতি সম্প্রদায়ের ৭২ শতাংশ মানুষ ভোট দেন।

সেই সমীক্ষাতেই বলা হয়েছিল, ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ওবিসি ভোট পেয়েছিল ২২ শতাংশ। আঞ্চলিক দলগুলি পেয়েছিল ৪২ শতাংশ। আর ১০ বছর পরে ২০১৯ সালে বিজেপির দখলে আসে ৪৪ শতাংশ ওবিসি ভোট। আঞ্চলিক দলের প্রাপ্তি কমে হয় ২৭ শতাংশ। সেই অঙ্কেই ২০২৪ সালের ভোট-প্রস্তুতি। এই সবকিছুই বিরোধীদের বোধগম্য হচ্ছে না বলেই মনে হয়। রাজনৈতিক দিক থেকে তার সাফল্য ভোটের বাক্সে কিছুটা হলেও আসবে তা এক্ষুনি বলে দেওয়া যায়। অষ্টাদশ লোকসভা ভোটের আগে রামমন্দির পুনর্নির্মাণ বিজেপির প্রতি দেশবাসীর বহুগুণ আস্থা বৃদ্ধি করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সম্প্রতি বিজেপির সংসদীয় দলের বৈঠকে বুঝিয়েছেন, ভোটপ্রাপ্তির হার ৫০ শতাংশ হলে বিজেপির পক্ষে ৩৫০ আসনের লক্ষ্যমাত্রা ছোঁয়া সম্ভব। এনডিএ-র বাকি শরিকদের নিয়ে তাহলে শাসক শিবিরের আসন ৪০০ পেরিয়ে যেতে পারে। বিজেপি কীভাবে এই লক্ষ্যপূরণ করবে, তা নিয়ে বিতর্ক আছে বা থাকতেও পারে। অন্যদিকে, কীভাবে বিজেপির অশ্বমেধের ঘোড়া আটকানো সম্ভব, তা নিয়ে 'ইন্ডি' জোটের শরিকদের মধ্যে আলোচনা চলছে। দলটির নাম যেহেতু বিজেপি এবং নেতার নাম নরেন্দ্র মোদী, তাই বিজেপির অতি বড়ো শত্রুও ৪০০ আসনের লক্ষ্যপূরণের সম্ভাবনা এক কথায় উড়িয়ে দিতে পারবেন না। ২০১৪ সালে 'অচ্ছে দিন' এবং গুজরাট মডেলকে সামনে রেখে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল বিজেপি।

বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধির পাশাপাশি নোটবন্দি, ত্রুটিপূর্ণ জিএসটির মতো সমস্যা থাকা সত্ত্বেও ২০১৯ সালে বিজেপির আসন সংখ্যা ৩০০ ছুঁয়ে ফেলেছিল। সেই অঙ্ক ধরে এগুলে বিজেপির পক্ষে ৪০০ না হোক, ৩৫০ আসনের মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলা খুব কঠিন নয় বলেই অনুমান। বিজেপি সর্বভারতীয় স্তরে ক্রমশ অপ্রতিরোধ্য ও অজেয় হয়ে ওঠার অন্যতম মূল কারণ হলো বিরোধীদের নীতিহীনতা। টানা ১০ বছর ক্ষমতায় থাকার পরও নরেন্দ্র মোদীর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা এখনও অটুট। লোকসভা হোক কিংবা পুরসভা, এখনও তিনিই বিজেপির মুখ। সেটাই বিজেপির সব থেকে বড়ো শক্তি। রাজ্য স্তরে বিজেপিকে জিততে যে বাধার সম্মুখীন হতে হয়, সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে তার ছিটেফোঁটাও থাকে না।

হিন্দি ভাষী রাজ্যে কংগ্রেস শূন্য। ভারতীয় রাজনীতির সত্যি হলো বহুল প্রচলিত সেই প্রাবদ, 'উত্তরপ্রদেশ যার, দিল্লি তার।' কংগ্রেস পুরোপুরি পর্যুদস্ত হিন্দি ভাষাভাষী তিনটি রাজ্যেই। গোটা দেশের নিরিখে কার্যত টিমটিম করে জ্বলছে শতাব্দী প্রাচীন কংগ্রেস। তাই দুর্বল প্রতিপক্ষের সুযোগে বিজেপি ৪০০ আসনের গণ্ডি ডিঙিয়ে ফেললে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা শুধুমাত্র ২০২৪-এর জন্য নয়, তারা ২০-২৫ বছরের পরিকল্পনা করছে। এই পেশাদারিত্ব কংগ্রেস বা অন্য কোনও বিরোধী দলের সর্বভারতীয় স্তরে নেই। শুধু বিজেপি সমস্ত সংবাদমাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণ করছে বা ইভিএম হ্যাক করা সম্ভব ইত্যাদি অভিযোগ তুলে কার্যসিদ্ধি করা বিরোধীদের পক্ষে বর্তমান দিনে সম্ভব নয়। রাজনীতির পাশাখেলায় প্রতিপক্ষকে হারাতে খেলা ভালো করে রপ্ত করা দরকার। শুধু অজুহাত আর অভিযোগ তুলে সাফল্য আসে না। এদিকে পদ্ম শিবিরের মুখে চারশো আসন পেরনোর যে টার্গেট শুনতে পাচ্ছি, সেটা সফল হয় কিনা সময়ই বলবে।

(লেখক পেশায় আইনজীবী)

দুষ্কৃতীদের অভয়ারণ্যে সাধুরা বিপন্ন

এই রাজ্যের হিন্দুদের বাঁচতে হলে, শিল্পসংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হলে, পশ্চিমবঙ্গের ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হলে হিন্দুদের বিভেদ ভুলে এক মন্ত্র গ্রহণ করতে হবে— 'আমরা হিন্দু'।

মণীন্দ্রনাথ সাহা

ভয়ংকর ঘটনা ঘটে গেছে পুরুলিয়ার কাশীপুরে। অবস্থা শুধু ভয়ংকর না, অত্যন্ত লজ্জাজনকও বটে। স্বাধীন ভারতে মহারাষ্ট্রের পালঘরের পরেই পশ্চিমবঙ্গেই ঘটে গেছে সেই লজ্জাজনক ঘটনা। ঘটনাটি অনেকেই হয়তো শুনে থাকবেন। সেটি হলো তিনজন সাধুকে বিনা অপরাধে চড়, কিল, ঘুষি মারা হয়েছে এবং চুল ধরে টানাটানি-সহ অকথ্য গালাগালিও করা হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের বরেলির বাসিন্দা তিনজন সন্ন্যাসী তীর্থদর্শনে বেরিয়ে ওড়িশার পুরীতে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শন করে মকরসংক্রান্তিতে গঙ্গাসাগরে পুণ্যস্নান ও কপিলমুনির মন্দির দর্শনের জন্য পুরুলিয়ার কাশীপুরে পৌঁছোন। সেখানে তাঁরা আহারের জন্য কাশীপুর গ্রামে ভিক্ষা করে চাল, আলু ইত্যাদি সংগ্রহ করে সেই অন্ন খেয়েছেন এবং গ্রামবাসীর সঙ্গে কথাবার্তাও বলেছেন। তারপর তাঁরা সেখান থেকে যাওয়ার সময় তিনজন কন্যাকে জিজ্ঞাসা করেছেন কোন পথে গঙ্গাসাগর যেতে হবে। এরপরই রটিয়ে দেওয়া হয় ওঁরা অপহরণকারী। তারপরই শুরু হয় সন্ন্যাসীদের ওপর গণপিটুনি। আরও জানা গিয়েছে সন্ন্যাসীদেরকে অপহরণকারী বলে যিনি রটিয়েছিলেন তিনি হলেন এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আদরের দুধেল গাই— এক সিভিক পুলিশ। এক ভিডিয়ো বার্তায় দেখা গেছে কী নির্মমভাবে সাধু তিনজনকে মারা হচ্ছে। তাঁদের সঙ্গে গাড়ি চালক এবং রাঁধুনিকেও ব্যাপক মারধর করা হয়েছে। ভিডিয়োতে শোনা যাচ্ছে, কে যেন বলছে— মার আরও মার। শেষপর্যন্ত পুলিশের কাছে খবর গেলে কাশীপুর থানার পুলিশ এসে

তাঁদের উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ১২ জন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য।

থানায় সাধুদেরকে লিখিত অভিযোগ জানানোর কথা বললে তাঁরা বলেছেন, অভিযোগ জানাবেন না, কারণ তাঁরা মনে করেন এটি তাঁদের কর্মফল। শেষে পুলিশ একটি সুয়োমোটো মামলা দায়ের করেছে। সংবাদ পেয়ে পুরুলিয়ার বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিংহ মাহাতো থানা থেকে সাধুদের এনে যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে নিরাপদে গঙ্গাসাগর যাবার ব্যবস্থা করে দেন।

অনেকেই বলছেন সাধুরা যে এই ঘটনাকে তাঁদের নিজেদের কর্মফল বলছেন তার রহস্য কী? কেউ কেউ বলছেন— অন্য রাজ্য থেকে এই রাজ্যে এলেই হয় মার খেতে হবে নয়তো প্রাণ হারাতে হবে। যেমন এর আগে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা এই রাজ্যে এলে তাঁকেও আক্রমণ করা হয়েছিল বহিরাগত বলে। এসব ভেবেই বোধহয় সাধুরা বলেছেন এই রাজ্যে আসাটাই হলো কর্মফল। কারণ এটাই পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সংস্কৃতি ও নিয়ম।

অন্যদিকে দেখুন, সাধুরা উত্তরপ্রদেশ থেকে ওড়িশায় গিয়েছেন সেখানে কিছু হয়নি, অথচ যেই পশ্চিমবঙ্গে এলেন অমনি মার খেলেন। বহু বছর আগে বিভিন্ন রাজ্য থেকে শিল্পপতিরা এসে এই রাজ্যকে শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্য তৈরি করেছিলেন। তারপর জ্যোতি বসু যেই এই রাজ্যের ক্ষমতায় বসলেন অমনি শিল্পপতিদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন জঙ্গি আন্দোলনের মার দিয়ে তাড়াতে লাগলেন। ফলে শিল্পসমৃদ্ধ রাজ্যে শিল্পের অস্তিত্ব বিলোপ হতে লাগল। শেষে বুদ্ধদেব ভট্টচার্য রাজ্যে শিল্পের দুর্দশার কথা ভেবে বহু কষ্টে টাটাগোষ্ঠীকে রাজ্যে যেই নিয়ে এলেন ওমনি তৃণমূল নেত্রী চক্লেট খেয়ে (ঠোঁটকাটা লোকেরা বলে) অনশনের নামে এমন মার দিলেন যার জন্যে শেষপর্যন্ত টাটাগোষ্ঠী শিল্প স্থাপনের কাজ শেষ করে এনেও সবকিছু ছেড়ে ছুড়ে পালাতে বাধ্য হলো। অথচ ওড়িশা বা অন্য রাজ্যে শিল্পপতিদের তাড়ানো হয় না। এখানে এখন প্রতি বছর শুধু শিল্প আনার নাটক করে চলে মোচ্ছব কিন্তু শিল্প আর আসে না।

উত্তরপ্রদেশের সাধুরা বলেছেন এটি তাঁদের কর্মফল। কিন্তু কেউ কেউ বলছেন, এটি সাধুদের কর্মফল নয়, এটা পশ্চিমবঙ্গের কর্মফল। এককালের সমৃদ্ধ এই রাজ্য এখন নরকে পরিণত হয়েছে। এখানে এখন ভালো মানুষের জায়গা নেই। যারা এখানে থাকেন তাদের অধিকাংশই চোর, গুন্ডা, লুঠেরা, ধর্ষক, জেহাদি নামে পরিচিত। আর শান্তি সংস্কৃতির পীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গ হয়ে উঠেছে বর্বর জেহাদিদের অভয়ারণ্য।

এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুর বলেছেন, 'এমন পরিবেশ কেন তৈরি হচ্ছে? সাধুদের এভাবে মারধর করা হবে এটা মেনে নেওয়া যায় না। রাজ্য সরকার চুপচাপ বসে শুধু দেখে চলেছে আর সংবাদমাধ্যম বিষয়টি তুলে ধরলে তারপর গিয়ে তদন্ত করছে।'

বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা বলেছেন, 'গেরুয়া রং নিয়ে এত সমস্যা কেন? গোটা দেশ আজ রামময়। সেখানে মমতা দিদির রাজত্বে সাধুদের উপরেও হামলা হচ্ছে।'

বিজেপি তথ্য প্রযুক্তি সেলের প্রধান অমিত মালব্য এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়ায় ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছে। মহারাষ্ট্রের পালঘরের মতো সাধুদের ওপর গণপিটুনির ঘটনা ঘটেছে সেখানে। সাধুদের বিবস্ত্র করে মারধর করা হয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে শাসক দলের লোকজন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে শেখ শাহজাহানের মতো দুষ্কৃতীরা রাজ্যের সুরক্ষা পায়, কিন্তু সাধুদের গণপিটুনির মুখে পড়তে হয়।'

কয়েক বছর থেকে একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, যে সমস্ত রাজ্য বিজেপি বিরোধী দলের শাসনে রয়েছে সেখানেই হিন্দুদের ওপর সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণ, নয়তো দেশবিরোধী স্লোগান--- পাকিস্তান জিন্দাবাদ বা পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলন অথবা হিন্দু, হিন্দুত্ব, গৈরিক পতাকা এবং সনাতন ধর্মের প্রতি আক্রমণ চলছে। কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে শাসকের প্রচ্ছন্ন মদতে অপরাধীরা কোনো সাজা পাচ্ছে না। সেই সমস্ত রাজ্যে হিন্দুরা কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছে।

অনেকেই বলছেন বিজেপি শাসিত রাজ্যের বাসিন্দারা এইসব ঘটনার পালটা হিসেবে এ রাজ্যের বেকার তরুণরা তাদের রাজ্যে রোজগারের জন্য গেলে তারা যদি বদলা নেয় আর সেই রাজ্য সরকার চুপ করে মজা দেখে তখন এরা কী করবেন? মনে রাখতে হবে, বারবার হিংসাই প্রতিহিংসার জন্ম দেয়। একপক্ষ অন্যায় করেই যাবে আর অপর পক্ষ বরাবরের জন্য চুপ করে থাকবে তা কখনোই চলতে পারে না। বিজ্ঞানের অমোঘ যুক্তি--- 'প্রতিটি ক্রিয়ার সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।'

এহেন ঘটনার পরেও রাজ্যের তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ, উদার বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবী, কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিক, সাংবাদিক প্রভৃতি মঞ্চ কাঁপানো বাঘা বাঘা রথী-মহারথীরা চুপ করে রয়েছেন কেন? কিছু বলুন? পালঘরের ঘটনার পরেও চুপ ছিলেন। এবার অন্তত কিছু বলুন। আমরা মূর্খ বঙ্গবাসী আপনাদের মতো মহান মনীষীদের মুখনিঃসৃত বাণী শুনে কৃতার্থ হই! এই রাজ্যে জেহাদিরা নিরাপত্তা পেলেও সাধুরা কেন নিরাপত্তা পাবেন না? এবং সাধুদের অপহরণকারী বলে রটনাকারী সিভিক পুলিশ কেন শাস্তি পারে না? রাজ্যবাসীর পক্ষে এই প্রশ্ন রাখতেই পারি।

এই রাজ্যের হিন্দুদের বাঁচতে হলে, শিল্পসংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হলে, পশ্চিমবঙ্গের ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হলে হিন্দুদের মধ্যে বিভেদ ভুলে গিয়ে এক মন্ত্র গ্রহণ করতে হবে— 'আমরা হিন্দু'। নচেৎ একবার যাঁরা বা যাঁদের পিতা-পিতামহ পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে এই রাজ্যে পালিয়ে এসেছিলেন তাঁদের এবং অবশিষ্ট বাঙ্গালিকে এ রাজ্য থেকে পুনরায় পালাতে হবে। কিন্তু পালিয়ে যাবেন কোথায়? সেটা ভেবে দেখবেন। সময় কিন্তু খুব কম। নব্বইয়ে দশকের কাশ্মীরের কথা মনে করুন। □

শ্রীরাম মন্দির উদ্বোধনে বিরোধীদের অনুপস্থিতি হিন্দু বিরোধিতার সিলমোহর

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

আমাদের জাতীয় আত্মার বাণী কী? ‘উত্তিষ্ঠত! জাগ্রত’— ‘উত্থান করো, জাগ্রত হও। এই বাণী উদ্‌ঘোষিত হইয়া গেছে। আমরা কে শুনিয়াছি, কে শুনি নাই, জানি না— কিন্তু ‘উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত এই বাক্য বার বার আমাদের দ্বারে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।...অশ্রুশিশিরধৌত আমাদের নবজাগরণের জন্য নিখিল অনিমেষনেত্রে প্রতীক্ষা করিয়া আছে— কবে সেই প্রভাত আসিবে, কবে সেই রাত্রির অন্ধকার অপগত হইয়া আমাদের অপূর্ব বিকাশকে নির্মল নবোদিত অরুণালোকে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে। কবে আমাদের বহুদিনের বেদনা সফল হইবে, আমাদের অশ্রুধারা সার্থক হইবে।’

২২ জানুয়ারির প্রভাতে যে মাহেন্দ্রক্ষণে বহু প্রতীক্ষিত ঘণ্টায় বিপুল আনন্দ-উৎসবে যখন বিশ্বভুবন শ্রীরাম তরঙ্গের উচ্ছ্বসিত আলোকে আলোড়িত, যখন ভারতের মধ্যযুগীয় ইসলামিক বর্বরতার অন্ধকার বসনাঞ্চল দূর করে পুনর্নির্মিত রামমন্দির উদ্বোধন হচ্ছে, প্রাণপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে রামলালার; তেজের, ঐতিহ্যের, অহংকারের মাধুর্যপ্রকাশ করছে ভারতবাসী, তখনও সংকীর্ণ রাজনীতির তুচ্ছ চাঞ্চল্যে অস্থির কংগ্রেস এবং তার পন্থী বেশকিছু রাজনৈতিক দল। এ আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত তা বলব না কিন্তু ভারতের সাংস্কৃতিক নবজাগরণের ক্ষণে তাদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত অনুপস্থিতি আমাদের আরও একবার অভিভূত করল। এবং তারা যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে প্রতিদিন ভারতীয়ত্বের বলি দিচ্ছে তা আবারও তারাই প্রমাণ করল।

এদেশের কংগ্রেস এবং তার পন্থী রাজনৈতিক দল এবং অতি অবশ্যই বামপন্থীরা রামনামে বিপ্লবপন্থী হয়ে যান। তারা রামের নামে আরও বেশি আন্দোলনজীবী হন। কারণটা খুব সহজ। কংগ্রেস ও বামপন্থীদের

প্রধান সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্য অভিন্ন। হিন্দুদের ইতিহাসকে চিরাভ্যাসবশত ব্রিয় রেখে মুঘল সাম্রাজ্যের জয়গান করা। তারা তো মুঘল সাম্রাজ্যের আগের ভারত এবং তার গরিমাকে উদ্দেশ্যযোগে ইতিহাসের বিশ্বযজ্ঞোৎসব থেকে দূরত্বে রেখেছিলেন। যত বেশি মুঘল জয়গান তত উর্বর মুসলমান ভোটব্যাংক। সে ট্রাডিশন এবং অলিখিত নীতি তাদের চিত্তবীণায় সর্বদা রুনুঝুনু করে। তাই রামমন্দির পুনর্নির্মাণ করার সুযোগ থাকলেও কখনও ভুল করেও কংগ্রেস ক্ষমতাকালে তা করেনি, এমনকী চেষ্টাও করেনি। বামপন্থীদের তো গণঘাতক স্তালিনই উপাস্য। রামমন্দির মামলায় কংগ্রেস বার বার আইনি ব্যাঘাত দিতে চেয়েছে। রামমন্দির শিল্যানাসের দিন যেন তাদের রাজনৈতিক বয়কট দিবস ছিল। কী হট্টগোল, নিয়মিত অভিঘাত, যে অভিঘাত গিয়ে পৌঁছায় আল জাজিরা'র সম্পাদকীয়তে। ইতিহাস ও নৃতাত্ত্বিক সত্যতায়তো সব অতি সেকুলার (পড়ুন ইসলামপন্থী) রাজনৈতিক দল বিশ্বাস রাখবেন— এমনটা কি আশা করাও ভুল? তাদের রাখতে হবে না শ্রীরামচন্দ্রে বিশ্বাস। কিন্তু যারা স্তালিনে হৃদয় প্রসারিত করেন তাদের মগজ কেন নৃতাত্ত্বিক, পুরাতাত্ত্বিক এবং প্রমাণিত ইতিহাসটাকেও সম্মান করল না! যে ইতিহাস উন্মোচিত হলো ভারতের মহামান্য শীর্ষ আদালতের তত্ত্বাবধানে।

এবং সেই উন্মোচিত ইতিহাস ও ভারত আত্মার জয়গাথা, আগ্রাসনবিরোধী ভারতীয় ঐতিহ্য শক্তি স্থাপনের নাম শ্রীরামমন্দির পুনর্নির্মাণ এবং এক শুভক্ষণে তার উদ্বোধন। সেই মাহেন্দ্র তিথিতে যে সব রাজনৈতিক দল উপস্থিত থাকলো না তাদের চিনে রাখল এ দেশের মানুষ। ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি কারা করে, তোষণ নীতি কাদের দরকার তা আবারও প্রমাণিত হলো। ওই সব

ঠুনকো রাজনৈতিক দল কী করল তার তোয়াক্কা করে না এ দেশের ঐতিহ্যে বিশ্বাসী মানুষ। তাই রামমন্দির উদ্বোধনের পর থেকে জনজোয়ার অযোধ্যায়। যে বিপুলতা টেক্কা দিল মক্কা কিংবা ভ্যাটিকান সিটির জনসমাগমকে। রাহুল গান্ধী, সীতারাম ইয়েচুরি, মমতা ব্যানার্জি এবং এই একই রুচির যারা সেদিন উপস্থিত হননি তারা তাদের রাজনৈতিক দৈন্যতায় চূর্ণ। তারা বিরোধিতার তীব্র বাসনায় পক্ষান্তরে অসংখ্য মানুষের আবেগকেও মূল্য দিলেন না। পরাধীন ভারত যুদ্ধ করল ইসলামিক বর্বরতার সঙ্গে, স্বাধীন ভারত যুদ্ধ করল পুরা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য। কংগ্রেস আমলে মন্দির সংস্কার মানেই তা ছিল মেরুকরণ কিন্তু ইসলাম তোষণে অশেষ শক্তি।

আর আজ ভারতকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে হিন্দুত্ব বিরোধী অপশক্তির বিরুদ্ধে। যে অপশক্তির দলে বিদ্যমান দেশেরই বেশ কিছু রাজনৈতিক দল। শ্রীরামমন্দির উদ্‌ঘাটনের দিন যখন উদ্দেশ্যযোগে রাহুল গান্ধী তাঁর নিজের রাজনৈতিক কাজে ব্যস্ত থাকার অজুহাত দেখান তখন বুঝতে হয় National consciousness এখনও আসেনি। বিরোধীদের সমস্যা শ্রীরামচন্দ্র, নাকি নরেন্দ্র মোদী, তা সত্যিই বোঝা দায়। এ প্রসঙ্গে মনে করাই ১৮ মে ২০১৪, লন্ডন থেকে প্রকাশিত Guardian-এ সম্পাদকীয় বাক্য ছিল, 'It should be obvious that the underlying changes in Indian society have brought us Mr. Modi and not the other way round.' তাই মোদীর আমল মানে ভারতের সুশাসন ও সুশাসনের প্রথম সূচক ইতিহাসের সংস্কার এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা— তা নিয়ে দ্বিমত নেই। শ্রীরামমন্দির পুনর্নির্মাণ তারই প্রতীক। ২২ জানুয়ারি যে যে রাজনৈতিক দল অনুপস্থিত ছিল, ধরে নেওয়া যায় তারা ইফতেহার পার্টিতে সেকুলারিজমের প্রাণস্পন্দন পায়। শ্রীরামচন্দ্রকে তারাই হিন্দু-মুসলমানে ভাগ করেছে। তারাই আসলে ভারতীয় মুসলমানদের ভোটব্যাংকের পৈতৃক সম্পত্তি বলে মনে করছে।

ভারতীয় মুসলমান যারা ভারতের ঐতিহ্যকে সম্মান করেন তারা কোনও বিরূপ প্রতিক্রিয়া করলেন না, শ্রীরামমন্দির পুনর্নির্মাণ ও উদ্বোধনে কিন্তু রাজনৈতিক জ্বালায় ২২ জানুয়ারি দিনভর অতিষ্ঠ থাকলেন মমতা ব্যানার্জি, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, উদ্ধব ঠাকরে, অখিলেশ যাদব, শরদ পাওয়ার এবং অতি অবশ্যই রাহুল গান্ধী। বিরোধীদের বক্তব্য ছিল— রামমন্দির নির্মাণ হলে আগুন জ্বলবে; তারাতো রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠায় নিজের রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষার দায়ে প্রাণপণ ছুটল। তারা এক বিষম রাজনৈতিক ভুল করল, বার বার অপপ্রচার করল এ হলো বিজেপি-আরএসএস-এর ভোট গিমিক। বিজেপির অনুষ্ঠান বলে দাগিয়ে দিল এবং অনুপস্থিত থাকলো এই মহাযজ্ঞে। তাদের এই বিরোধিতা সত্যিই ভোটে রূপান্তরিত হবে তো? কারণ তারা যে ভারত আত্মার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রকাশ করল তা কে না বুঝল! যারা বুঝল তারা কি সবাই বিজেপির ভোটার নাকি! ইতিহাসের পাতা উলটাচ্ছে। বদলাচ্ছে বিকৃত ইতিহাস। মানুষ জানছে গোহত্যার প্রতিরোধে অবস্থানরত সাধুদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী। তারা রামরাজ্য কোনোকালেই চাননি। তাই আজ যখন মল্লিকার্জুন খাড়্গে কিংবা অধীর চৌধুরী, সোনিয়া গান্ধী রামমন্দির উদ্‌ঘাটনে অনুপস্থিত থাকেন তখন বুঝতে বাকি থাকে না ওরা আসলে ৫০০ বছরের মধ্যযুগীয় লাঞ্ছনার ইতিহাসেই ভারতকে আবদ্ধ রাখতে চায়। ওরা শৃঙ্খল ভাঙার ইতিহাসে ভোট হারানোর আরও বেশি ভয় পায়। কেউ শ্রীরামচন্দ্রকে কেবলমাত্রই দেবতা হিসেবে গ্রহণ করেন। কেউ ভাবেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজাবৎসল রাজা, কেউ তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজবিদ ও রাষ্ট্র নির্মাতা হিসেবেও দেখতে পারেন। কেউ তাঁকে অবতার ভাবেন, কেউ রক্তমাংসের মানুষ যিনি নির্মোহ আবেগে কেবলমাত্র প্রজাপ্রীতি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াই করলেন। ইতিহাসকে, বিশ্বকে দেখালেন ভেদাভেদহীন নেতৃত্ব কাকে বলে।

বুদ্ধিমত্তার শ্রেষ্ঠ নাম শ্রীরামচন্দ্র। তিনি অজেয়, তিনি অদম্য, তিনি একাধারে শক্তির প্রতীক আবার অন্যদিকে স্নিগ্ধ স্থির ধীর বিচক্ষণ ও সত্য রক্ষার দায়িত্বে অবিশ্রান্ত। শ্রীরামচন্দ্র, ভারতীয়ত্ব ও জাতীয়তাবোধ সমার্থক। ভারতের বামপন্থীদের স্লোগান ওঠে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। তবে কেন শ্রীরামচন্দ্রে এত আপত্তি? যে রামচন্দ্র লঙ্কা জয়ের পরেও বিন্দুমাত্র মোহ না রেখে পুনরায় দেশে ফিরলেন--- বললেন 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী'— তাঁর নামে গাত্রদাহ কেন সেই ইন্টেলেকচুয়াল সম্প্রদায়ের? অথচ সেই অতি বুদ্ধিজীবীরা আগ্রাসনবাদী মুঘল যুগকে স্বর্ণাক্ষরে লিখতে ব্যাকুল। তাদের এই দ্বিচারিতাই তাদের রাজনৈতিকভাবে দিন দিন হাস্যকর করে তুলেছে। তারা যে হিন্দুত্ব ফোবিয়ায় ভুগছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, সংঘাত অত্যন্ত সাধারণ বিষয় এবং তা অপ্রিয় ঠেকলেও নিশ্চিত ভাবে রাজনীতির অংশ। রাজনৈতিক প্রভেদ গণতান্ত্রিক শক্তিকে স্পষ্ট করে। কিন্তু সেই বিরোধিতা যদি রাষ্ট্র ঐতিহ্যে আঘাত করে, জাতীয় সৌন্দর্যের বিরুদ্ধাচারণ করে, তখন তা ইতিহাস ও দেশকে অবমানার নামান্তর।

তাঁরা প্রশ্ন তুলেছিল কেন সরকার রামমন্দির করছে। উত্তর পেয়েছে— এ মানুষের অনুদান। তারপরেও যদি বিরোধী রাজনৈতিক দল অনুপস্থিত থাকে তখন তা প্রকট করে যে তারা কতটা মানুষের বিরোধিতা করছে। তারা কতটা হিন্দুবিদ্বেষী, তারা কতটা আপন আপন কর্মশালাকে জাতীয় অনুভূতির চাইতেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। কখনও কখনও প্রভেদ অস্পষ্ট করতে হয় এবং তা জাতীয় স্বার্থেই। কিন্তু আমাদের দেশের কংগ্রেস ও বামপন্থীদের সে বোধ নেই। তাই ভারতীয় সেনা থেকে শ্রীরামচন্দ্র— সবেতেই প্রকাশ্য বিরোধিতা করে। শ্রীরামচন্দ্র প্রেমের নিভৃত নির্ভর স্থান। তাই তাঁকে উপেক্ষা করে ভারতীয় সংস্কৃতি-প্রেমী সাজা অসম্ভব। প্রয়োজনের বাধ্যতায় শ্রীরামচন্দ্র আবদ্ধ নন, তিনি সাংস্কৃতিক তাড়না। সেই তাড়না বোধ করে না বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি। ভোট আকর্ষণের চেয়ে রাষ্ট্রীয় গরিমা যেদিন অধিক গুরুত্ব পাবে সেদিনই রামবিরোধীরা প্রকৃত অর্থে শ্রীরামজন্মভূমিতে মন্দির পুনর্নির্মাণের মহিমা উপলব্ধি করবে। যত বেশি হিন্দুত্ব বিরোধিতা রাজনৈতিক পরিসরে হবে, তার চাইতে ঢের বেশি হিন্দুত্বের রথচক্র দুরন্তগতিতে ছুটবে। তাই যারা বিরোধ করার করুক, এই রঙ্গভূমিতেই হিন্দুত্বের ইতিহাস পুনর্নির্মাণের অঞ্জলি বার বার রচিত হবে ২২ জানুয়ারির মতো। □

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

কংগ্রেস নেতারা ২২ জানুয়ারি রামমন্দির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেননি। সোমনাথ মন্দির উদ্বোধনের ব্যাপারে জওহরলাল নেহরু ১৯৫১ লালে একই অবস্থান নিয়েছিলেন। কংগ্রেস প্রথমাবধিই হিন্দুবিদ্বেষী দল।

কংগ্রেসের অভিযোগ এটা 'আরএসএস-বিজেপির অনুষ্ঠান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত'। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা বলেছেন, 'এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাঁরা প্রতীকীভাবে হিন্দু সমাজের কাছে ক্ষমা চাইতে পারতেন। ইতিহাস তাদের হিন্দুবিরোধী দল হিসেবে গণ্য করবে'। কর্ণাটক বিজেপি সভাপতি সিটি রবি কংগ্রেসকে বলেন, 'কংগ্রেস বরাবরই হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে। সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণ করেছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ এবং কে এম মুন্সি। সেই সময়ে জওহরলাল নেহরু প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি সোমনাথে যাননি।

অযোধ্যার শ্রীরামমন্দির এবং কিছু প্রশ্ন

তাহলে বর্তমান নেতৃত্ব কী করে রামমন্দিরে যাবে?'

২০১৭ সালে রাহুল গান্ধী সৌরাষ্ট্র মন্দিরে গেলে নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, 'সর্দার প্যাটেল যখন সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণের কাজ হাতে নেন তখন নেহরু অসন্তুষ্ট ছিলেন। যখন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসবেন বলেন তখন নেহরু তাঁকে একটা চিঠি লিখে বারণ করেছিলেন। যারা সোমনাথ মন্দিরের বিরুদ্ধে কাজ করেছে সাহসী মানুষের এই দেশ তাদের ক্ষমা করবে না'।

সোমনাথ মন্দির গুজরাটে অবস্থিত। দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। বিদেশি আক্রমণকারীরা ১৭ বার তা ভাঙে। বারবার পুনর্গঠিতও হয়। শেষবার আওরঙ্গজেব তা ভাঙে। স্বাধীনতার পরে পুনর্নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত সেই অবস্থায়ই ছিল। স্বাধীনতার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্যাটেল সোমনাথ মন্দিরের হৃত গৌরব ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তবে নেহরু বলেছিলেন যে এটা করলে মুসলমানদের মনে আঘাত দেওয়া হবে। ১৯৪৭ সালের মাত্র কয়েক বছর পরে করদ রাজ্য জুনাগড় ভারতীয় ইউনিয়নে যোগদানের পরে সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণের পকিল্পনা হয়। কে এম মুন্সি সোমনাথ মন্দির নির্মাণের দায়িত্ব নিলে নেহরু তাকে 'হিন্দু পুনরুজ্জীবনের' প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করেছিলেন। রামচন্দ্র গুহ লিখেছেন, 'হিন্দু ও মুসলমান মাত্র কয়েক বছর আগে অনেক দিন পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী দাঙ্গায় লিপ্ত ছিল। নেহরু নতুন করে দুই সম্প্রদায়ের পুরনো ক্ষত খুঁচিয়ে তুলতে চাননি, তখন ভারতে শান্তি ফিরে আসছিল। কিন্তু সময় খুব অশান্ত ছিল। নেহরু বলেছিলেন গজনির মাহমুদের সঙ্গে ভারতের মুসলমানদের কোনো সম্পর্ক ছিল না।' নেহরু চেয়েছিলেন সরকারের টাকায় নয়, জনসাধারণের অনুদানের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হোক, কারণ সেই তুষ্টিরণের রাজনীতি। এর পর ভারতব্যাপী এক অনুদানসংগ্রহ অভিযান চালানো হয় এবং সোমনাথ মন্দির অনুদানের টাকায় তৈরি হয় যেভাবে এখন অযোধ্যায় রামমন্দির তৈরি হচ্ছে।

১৯৫১ সালে মন্দির উদ্বোধনের আগে নেহরু রাজেন্দ্র প্রসাদকে লিখেছিলেন, ...'মন্দির উদ্বোধনের সঙ্গে আপনার নিজেকে যুক্ত করা আমি পছন্দ করি না। এটা শুধু মন্দির পরিদর্শন নয়..., কিন্তু এর ক্ষতিকর কিছু ফল আছে,' নেহরুর আপত্তি সত্ত্বেও রাজেন্দ্র প্রসাদ ১৯৫১ সালের মে মাসে সোমনাথ মন্দিরের উদ্বোধনে যোগ

দিয়েছিলেন। রাজেন্দ্র প্রসাদ খুব ভালো যুক্তি দিয়েছেন, 'আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হলে আমি কোনো মসজিদ বা গির্জার ক্ষেত্রেও তাই করব... এটা ভারতীয় সবধর্ম সমভাবের লক্ষণ। আমাদের দেশ ধর্মহীন বা ধর্মবিরোধী নয়'।

রামজন্মভূমি মুক্তি আন্দোলন কোনো জঙ্গি আন্দোলন ছিল না, হিন্দুদের প্রতি ঐতিহাসিক অন্যায়ের ন্যায়বিচারদান

প্রায় ৫০০ বছর আগে রামজন্মভূমি আন্দোলন শুরু হয়েছিল। তবে এর একটা গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণ ফৈজাবাদের জেলাশাসক আই সি এস অফিসার কে কে নায়ারের সাহসী পদক্ষেপ। হিন্দুরা বলেন, তিনিই 'রাম জন্মভূমি মুক্তি আন্দোলন' শুরু করেছিলেন।

বিতর্কিত ধাঁচায় মূর্তি প্রকটের কয়েক মাস আগে ১৯৪৯ সালের জুনে নায়ার ফৈজাবাদের জেলাশাসক নিযুক্ত হন। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পন্থ ও প্রধানমন্ত্রী নেহরু নায়ারকে মূর্তি সরাতে বলেন কিন্তু দৃঢ়চেতা নায়ার সেই আদেশ মানেননি। দু'জনই বলেছিলেন মূর্তি না সরালে মুসলমানরা ক্ষিপ্ত হবে আর শ্রীনায়ার বলেছিলেন মূর্তি সরালে হিন্দুরা আরও বেশি ক্ষিপ্ত হবে।

নায়ারের ভাগ্নে পিল্লাই তাঁর স্মৃতিতে বলেন, 'অযোধ্যার জনগণের কাছে তিনি এখনও 'নায়ার সাব'। ...নায়ার ধর্মান্ধ হিন্দু ছিলেন না। তিনি ন্যায়ের পক্ষে ছিলেন, হিন্দু সন্ন্যাসীদের উচ্ছেদ ও মূর্তি অপসারণ না করে রক্তপাত এড়াতে চেয়েছিলেন। 'আমি সন্ন্যাসীদের রক্তের মূল্যে চাকরি চাই না' এটাই তাঁর অবস্থান ছিল। তিনি জানতেন যে এই আদেশ অমান্য করার তথাকথিত অপরাধে তাঁকে সাসপেন্ড করা হবে'। আইনানুসারে জেলাশাসক আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে শেষ কথা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী নন। তিনি লিখিতভাবে যে মতামত দেন তার অন্যথা করার ক্ষমতা কারও নেই, প্রধানমন্ত্রীরও নয়। আর ঠিক সেই কাজই তিনি করেছিলেন। লিখিতভাবে তিনি জানিয়েছিলেন যে আইনশৃঙ্খলার স্বার্থে রামলালার মূর্তি অপসারণ করা যাবে না। পন্থ ও নেহরু তা মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। নতুবা জরুরি অবস্থা জারি করতে হতো। কিন্তু তাঁদের ক্ষমতা ছিল জেলাশাসককে সাসপেন্ড বা বদলি করা। তাঁরা নায়ারকে সাসপেন্ড করেছিলেন। তাঁরও অধিকার ছিল আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার। তিনি তাই করেছিলেন এবং জিতেছিলেন। কিন্তু তিনি চাকরি বজায় রাখতে নয়, নীতিগত কারণে আইনি পথে গিয়েছিলেন। তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে তিনি সঠিক, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ভুল। তাই জিতেও নায়ার চাকরি ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং এলাহাবাদে আইনজীবী হিসেবে অনুশীলন করেন।

কে কে নায়ারের সঙ্গে স্মরণ করতে হয় আরেকজনকে, কে কে মহম্মদ। ১৯৭৬-৭৭ সালে যখন অযোধ্যা কোনো বিশেষ ইস্যু ছিল না তখন প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আধিকারিক মহম্মদ শিক্ষণার্থী হিসেবে প্রফেসর লালের অধীনে এই স্থানে কাজ শুরু করেছিলেন। লাল প্রথম খননে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। মহম্মদ প্রাপ্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ তুলে ধরে ১০০টিরও বেশি হিন্দু মন্দিরের তিনি হদিশ দেন, বাবরি মসজিদের নীচে একটি মন্দিরের অস্তিত্বের কথা জোর দিয়ে বলেন, 'আমরা ১২টি স্তম্ভ দেখেছি... সেগুলো কোনো একটি মন্দিরের ছিল তা বোঝা যায়। স্তম্ভগুলির নীচের অংশে হিন্দুধর্মের সমৃদ্ধির প্রতীক 'পূর্ণ কলস' ছিল। এটি অন্যতম 'অষ্টমঙ্গল চিহ্ন' যা সাধারণত হিন্দু ভবনগুলিতে পাওয়া যায় বিশেষ করে দ্বাদশ শতকে। এটাই ছিল প্রথম প্রমাণ। তারপর অধ্যাপক লাল পশ্চিম ও দক্ষিণ অংশ খনন করেন যেখানে হিন্দু মন্দিরের বৈশিষ্ট্যযুক্ত আরও ভাস্কর্য পাওয়া যায়। কিছু মুখ বিকৃত ছিল কিন্তু প্রতীকগুলো যথেষ্ট পরিষ্কার ছিল। এটা দ্বিতীয় প্রমাণ। টেরাকোটা মূর্তি ছিল তৃতীয় প্রমাণ। ড. লাল উপসংহারে পৌঁছেছেন যে মসজিদের নীচে একটি মন্দির থাকতে পারে।'

পরে সমালোচনার মুখেও মহম্মদ প্রফেসর লালের অনুসন্ধানগুলোকে সমর্থন করেন, তাঁরও এতে অংশগ্রহণের বিষয় নিশ্চিত করেন এবং ওই স্থানে একটি মন্দির নির্মাণের পক্ষে কথা বলেন। 'প্রফেসর লাল তাঁর কাজকে তুলে ধরেননি এই ভেবে যে এটা মানুষকে উত্তেজিত করতে পারে। তিনি একে অ্যাকাডেমিক অনুসন্ধান হিসেবে একপাশে সরিয়ে রেখেছিলেন। এক দশকেরও বেশি সময় পরে একদল মার্কসবাদী ঐতিহাসিক একটি স্বতঃপ্রণোদিত বিবৃতি দিয়েছিলেন যে অধ্যাপক লাল মন্দিরের সঙ্গে জড়িত কিছু পাননি... প্রফেসর লাল আত্মপক্ষ সমর্থন করতে সাংবাদিকদের কাছে আবারও একটি যথাযথ প্রতিবেদন দিয়েছিলেন।'

মহম্মদ বলেছিলেন যে বহু শতাব্দী আগে মন্দির ধ্বংস ঘিরে হিন্দুরা যে বেদনা অনুভব করেছিলেন তা স্পষ্ট ছিল, 'অযোধ্যা হিন্দুদের জন্য ততটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল মুসলমানদের জন্য মক্কা ও মদিনা'। হুমকি ও ফতোয়ার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও তিনি তার দৃঢ় বিশ্বাসে অটল ছিলেন। ফলে তাঁর বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ তদন্ত হয় এবং তাঁকে গোয়ায় বদলি করা হয়। কে কে মহম্মদ প্রফেসর বি.আর মণির নেতৃত্বে দ্বিতীয় খননের বিস্তৃত কাজের কথা তুলে ধরে স্তম্ভ, ভাস্কর্য, পোড়ামাটির মূর্তি এবং একটি মন্দিরের ইঙ্গিতকারী শিলালিপি আবিষ্কারের কথা বলেন, 'আমার কাজে আমিই একমাত্র মুসলমান ছিলাম... কিন্তু মণির খননের সময়ে নিযুক্ত শ্রমিকদের এক-চতুর্থাংশ মুসলমান ছিল যাতে কোনো পক্ষপাতিত্ব বা হেরফের না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য। সবকিছুর ভিডিয়ো করা হয়েছে— সত্য বেরিয়ে এসেছে প্রবলভাবে'। কাশী ও মথুরার বিষয়ে মহম্মদ বলেন, 'আমি মনে করি মুসলমানদের স্বেচ্ছায় এই কাঠামোগুলো হিন্দুদের হাতে তুলে দেওয়া উচিত'।

রামমন্দির অসম্পূর্ণ বলে দুজন শঙ্করাচার্যের অভিযোগ ধোপে টেকে না। সোমনাথ মন্দির উদ্বোধন হয় ১৯৫১ সালে আর সম্পূর্ণ হয় ১৯৯৫ সালে। তখন কেউ বলেননি সেটা অসম্পূর্ণ তাই উদ্বোধন করা যাবে না। দ্বারকা ও শৃঙ্গেরির শঙ্করাচার্যরা তেমন কোনো অভিযোগ তোলেননি! সুতরাং বিরোধীদের শঙ্করাচার্যের প্রতি এত নিষ্ঠা মানানসই নয়। □

মননশীল নিবন্ধ

স্বস্তিকা পত্রিকায় ১ জানুয়ারি ২০২৪, প্রচ্ছদ নিবন্ধ স্বামী আত্মবোধানন্দের মননশীল নিবন্ধ 'ভক্ত ও ভগবান : শ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যানে' লেখাটি পড়ে মুগ্ধ হলাম।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন ভক্ত বৎসল। তাঁর জীবনের লীলাপ্রসঙ্গে আমরা দেখি ঠাকুর শ্রীরামৃষ্ণ সবসময় বহুপ্রকার ভক্ত সমাগমের মধ্যে থেকে ভক্তদের সঙ্গে ধর্মবিষয়ে খুব সহজ ও সরল ভাবে উপদেশ দিচ্ছেন। এইরকমই এক সময়ে আমরা শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যাকে আমরা শ্রীম বলে জানি, তিনি দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে এসেছিলেন। তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শনে মনে করেছিলেন যে শুকদেব ভক্ত পরিমণ্ডিত হয়ে উপদেশ দিচ্ছেন। পরে তো তিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে দীক্ষা নেন এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' এই অমূল্য বইটি রচনা করেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছোটো ছোটো গল্পের মাধ্যমে তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিতেন। সহজ সরল ভাষার উপদেশ সব ভক্তই যাতে বুঝতে পারেন সেইটাই ছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশ্য।

আমাদের সংস্কৃত ধর্ম গ্রন্থ যেমন বেদ, বেদান্ত বা উপনিষদ সাধারণ নিরক্ষর লোক পড়তে বা বুঝতে পারেন না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সব কঠিন ধর্মগ্রন্থের মূল বিষয়কে ছোটো ছোটো গল্পের মাধ্যমে শিষ্যদের কাছে তুলে ধরতেন, যাতে তারা ঈশ্বরকে খুব সহজ ও সুন্দর করে বুঝতে পারে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজ দেহকে দেখিয়ে বলছেন যে, এই দেহ ভগবান ও ভক্তের দেহ। এর মধ্যেই দুটি আছে, একটি ভক্ত আর একটি ভগবান। এই ভক্ত ও ভগবানের লীলা সাধারণ মানুষের কাছে তিনি অবতার রূপে করেছেন। প্রেমের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সমগ্র জীবন দিয়ে দেখিয়েছেন যে ঈশ্বর কোনো কঠিন জিনিস নয়। তাঁকে যদি কেউ অন্তর থেকে ভক্তিকরে দিনে একবার স্মরণ করে তাহলেই সেই ব্যক্তির ঈশ্বর লাভ সম্ভব হতে পারে। স্বামী আত্মবোধানন্দ মহারাজকে প্রণাম, তাঁর লেখা পড়ে সমৃদ্ধ হলাম।

—সঞ্জয় ব্যানার্জী,
চুঁচুড়া, ব্যারাক রোড, হুগলী।

বামেদের রাম বিরোধিতার শেষ কোথায়?

সকলের অধীর অপেক্ষার অবসানে গত ২২ জানুয়ারি রামমন্দিরের উদ্বোধন হয়েছে। দেশবাসী আনন্দে উদ্বেল। রামনামের জোয়ারে মাতোয়ারা গোটা দেশ। এরই মধ্যে হাতি দেখে কুকুরের চীৎকারের মতো বামপন্থীরা রাম বিরোধিতায় নেমেছে। তাদের হাজারো অকথ্য কুকথায় তারা আক্রমণ করছে রামচন্দ্রকে। তারা বরাবরের মতোই বলছে রাম বাঙ্গালির নয়, হিন্দিভাষীদের; তারা বলছে অসত্য ও নানা কুকথা। কিন্তু তাদের এ কুকথায় কান না দিয়ে আমাদের দেশবাসী আজ রাম বন্দনায় মত্ত হয়েছে পরমানন্দে। দেশবাসী বুঝিয়ে দিয়েছে বামপন্থীদের রাম বিরোধিতা নিতান্তই অসার।

—নারায়ণ রায়,
কোন্নগর, হাওড়া।

আসছে হিন্দু সুনামি

সুন্দর কৌশল করে আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রীতি যাত্রার মাধ্যমে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিন রাজ্যের আইন শৃঙ্খলাকে সঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করলেন এবং অযোধ্যার রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানকে প্রকারান্তরে সার্বিক প্রচারও করে দিলেন। তিনি গত ১২ বছরে এই রাজ্যে পজিটিভ বা নেগেটিভ যা কিছু করেছেন, তাতে হিন্দুত্ব ও ভারতীয় আবেগ এই রাজ্যে বেড়ে গিয়েছে। এই জন্যে মুখ্যমন্ত্রীকে আংশিক 'কৃতিত্ব' দিতেই হবে। আগামীদিনেও সনাতনী কোনো অনুষ্ঠান বা উদযাপন (সেটা রামনবমী হোক বা শিবাজী উৎসব বা হনুমান জয়ন্তী যেটাই হোক না কেন) মাত্রেই সেটি একটি বিশেষ রাজনীতির রঙে রাঙিয়ে সেটির প্রতি রাজ্য প্রশাসনের অসহযোগিতা বা দমনপীড়ন চলবে— সেটাই এই রাজ্যে স্বাভাবিক। কিন্তু এত বৈপরীত্যের মাঝেও, যত দিন যাচ্ছে, এই রাজ্যে সনাতনী আবেগ বৃদ্ধি পাচ্ছে গুণোত্তর প্রগতিতে। আগামীদিনেও রামমন্দির ও হিন্দুত্ব নিয়ে সনাতনী আবেগ এই রাজ্যে যত বেশি আঘাত পাবে, সেই আঘাতে তার ঝংকার আরও বেড়ে উঠবে।এই রাজ্যের লক্ষ লক্ষ হিন্দু মানুষ 'ভেকধারি ও ভণ্ড' সেকুলারিজমের ফাঁদে আর না পড়ে ভারতীয় সংস্কৃতির হাজার হাজার বছরের আবহমান সনাতন সংস্কৃতিতে নিজেদের অঙ্গীভূত করতে এগিয়ে আসছে। যতদিন যাচ্ছে, তত বেশি মানুষ সেই সনাতনী 'ধর্মযোগে' নিজেদের সংযুক্ত করছে।

মনে রাখতে হবে যে এই রাজ্য রাজা শশাঙ্কের, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের, রাজা ধর্মপালের, বীর মল্ল রাজাদের, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের, স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের, সাধক বামাক্ষ্যাপার, কবি কৃত্তিবাসের, রানি রাসমণির, দেবী চৌধুরানীর, বাঘা যতীনের, খুদিরামের, ঋষি অরবিন্দের, স্বামী বিবেকানন্দের, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর, গোপাল মুখার্জির এবং অবশ্যই এই রাজ্য ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের। বিশ্ববন্দিত ভারতমাতার অনেক বীর ও মহান সন্তানের উত্তরসুরী আমরা এই রাজ্যবাসী। তাই মহান উত্তরাধিকারের এই রাজ্যবাসীকে শুধু রাজনীতির রঙে রাঙিয়ে বেশিদিন অন্ধকারে রাখা যাবে না। স্বাধীনতা পরবর্তী পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করছে। গত ২৪ ডিসেম্বর ২০২৩ ব্রিগেডে ঐতিহাসিক লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক ২২ জানুয়ারি ২০২৪ অযোধ্যার রামমন্দিরে রামলালার প্রাণ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে সারা রাজ্যের সনাতনি জাগরণ— পশ্চিমবঙ্গের স্বতস্ফূর্ত সনাতনী ভাবের উদগীরণ ঘটেছে। আর এই উদগীরণ আগামীদিনে পশ্চিমবঙ্গের সনাতনী মানুষকে

ফঃ ৩

এক সূত্রে বাঁধবে, তৈরি হবে এক শক্তিশালী সনাতনী ঐক্য ও কঠিন সংকল্প।

মর্যাদা পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কুলদেবতা এবং ভগবান শ্রীরামচন্দ্র হাজার হাজার বছর ধরে এই বঙ্গের মাটিতে পুজিত হয়েছেন এবং হবেন। তাই এই রাজ্যের প্রতিটি কোণায় ২২ জানুয়ারি ২০২৪-এ শ্রীরামচন্দ্র যেভাবে পূজিত হয়েছেন এবং এই রাজ্যের গ্রামগঞ্জ-রাস্তা-শহর-কানাগলি যেভাবে জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে মেতে উঠেছে, তাতে বিশ্বাস যে, এই দিব্য জাগরণ নিয়ে, তার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে সনাতন বাঙ্গালি আবার জেগে উঠবে। তার জন্যে কোনো যেমন রাজনীতির সাহায্যের দরকার হবে না, তেমন কোনো রাজনীতি দিয়ে এই সনাতনী জাগরণকে থামিয়েও রাখা আর যাবে না। সেই জোয়ার শুরু হয়েছে, সুনামি শুধু সময়ের অপেক্ষা।

—**সুশান্ত মজুমদার,**
কল্যাণী, নদীয়া।

রাম জন্মভূমি মন্দির

ভগবান রামচন্দ্রের জন্মভূমি নিয়ে দীর্ঘদিনের আইনি লড়াইয়ের অবসান হলো। সেইসঙ্গে গোটা ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজের মানুষের ভগবান রামচন্দ্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হলো। গত ২২ জানুয়ারি ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। অযোধ্যার যেই স্থলে বাবরি মসজিদ ছিল সেই স্থানে ৫০০ বছর আগে ভগবান রামচন্দ্রের মন্দির ছিল। এই তথ্য ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ববিদগণ স্বীকার করেছেন ও প্রামাণ্য বলে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে সত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মহামান্য কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী রামজন্মভূমির বিতর্কের অবসান হয়েছে। কোটি কোটি টাকা খরচ করে ভগবান রামচন্দ্রের মন্দির নির্মাণ করা হয়েছে এবং রামলালার মূর্তি প্রতিষ্ঠা হয়েছে। গোটা ভারতবর্ষের হিন্দু সনাতনী ভক্তদের আবেগ ও উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো ছিল। সন্ধ্যায় শুরু হয়েছিল অকাল দীপাবলী।

উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যা এখন গোটা ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো তীর্থস্থান ও পুণ্যভূমি। ইতিহাস বলছে ১৫২৮ সালে রামমন্দিরের উপর বাবরি মসজিদ স্থাপন করেছিল তৎকালীন মুঘল আক্রমণকারী বাবরের নির্দেশে তার সেনাপতি মীর বাকি। পরবর্তীতে অনেক বিতর্ক, অনেক বাদানুবাদ হয়েছে এই মন্দির ঘিরে। দেশের স্বাধীনতার পরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও তার সহযোগী সংগঠন দাবি করে আসছিল যেখানে বাবরি মসজিদ স্থাপন হয়েছে সেই স্থানে হিন্দুদের দেবতা রামচন্দ্রের জন্মভূমি এবং ওই স্থানে রামমন্দির ছিল। দীর্ঘদিন মামলা চলার পরে ২০১৯ সালে সুপ্রিম কোর্ট সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ, তথ্যের ভিত্তিতে ওই স্থানে রামমন্দির স্থাপনের জন্যে নির্দেশ দেন এবং বাবরি মসজিদ স্থাপন করার জন্য একটি বিকল্প জায়গা চিহ্নিত করে দেন। এই ঐতিহাসিক রায়ের পর হিন্দু সনাতনী ভক্তদের তাদের ভগবানের মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হয়। ২২ জানুয়ারি ২০২৪ সাল হলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ যেদিনের জন্য হিন্দুরা এতদিন অপেক্ষা করে ছিল। এই বিষয়টি নিয়ে আজ যে রাজনৈতিক রং ছড়ানো হচ্ছে সেটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশের পক্ষে মোটেই ভালো নয়। গোটা দেশের বহু মানুষের অনুদানে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে এই রামমন্দির স্থাপন করা হয়েছে। তাই রামমন্দির স্থাপন নিয়ে কোনো বিভাজন করা উচিত নয়।

—**চিত্তরঞ্জন মান্না,**
চন্দ্রকোনারোড, পশ্চিম মেদিনীপুর।

গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভের কলঙ্ক স্বরূপ

সংবাদপত্রকে গণতন্ত্রের চতুর্থস্তম্ভ নাকি বলা হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের বাজারি পত্রিকা এবং যারা ভগবানকে ছাড়া কাউকে ভয় করে না, তারা কিন্তু মিথ্যার বেসাতি করে চলেছে। গত ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সংহতি মিছিলের নামে রাজ্যের দুধেল গাইদের খেপিয়ে তোলার যে কাজটি করেছেন, তাকেই হাইলাইট করা ওই পত্রিকাগুলি। সারা বিশ্ব যখন অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দিরের প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক দিক দেখতে পাচ্ছে, তখন পশ্চিমবঙ্গে দুটি পত্রিকা নেতিবাচক সংবাদ পরিবেশন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে চলেছে। এরা গণতন্ত্রের চতুর্থস্তম্ভের কলঙ্ক স্বরূপ।

—**অসীম চক্রবর্তী,**
বড়জোড়া, বাঁকুড়া।

দলদাস বিচারপতি!

সম্প্রতি একটি নতুন অভিযোগে মূলধারার সংবাদমাধ্যম হতে সামাজিক মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে আলোড়ন। কলকাতা হাইকোর্টের অধিকাংশ বিচারপতি উচ্চ ন্যায়ালয়ের মহান আদর্শের ধারক ও বাহক হলেও, এই অভিযোগ অনুযায়ী বিচার বিভাগের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট এক শ্রেণীর কিছু মুষ্টিমেয় বিচারপতি ও আধিকারিক পশ্চিমবঙ্গের চরম দুর্নীতিগ্রস্ত শাসক দলের রাজনৈতিক নেতা-মন্ত্রীদের বিশেষ ঘনিষ্ঠ ও তারা নানা ভাবে রাজ্য সরকারের শীর্ষ স্তরের সঙ্গে গোপনে হাত মিলিয়ে রয়েছেন। এই কারণে সিঙ্গল বেঞ্চের একাধিক উল্লেখযোগ্য রায় অ্যাপিল প্রক্রিয়ায় ডিভিশন বেঞ্চে যাওয়া মাত্রেই হয়ে যাচ্ছে পরিবর্তিত। বেশিরভাগই সম্মুখীন হচ্ছে স্থগিতাদেশের। কখনও-বা মামলা হয়ে যাচ্ছে খারিজ!

সম্প্রতি তাঁর এজলাসে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের তরফে তুলে ধরা এবং একটি সরকারি নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলায় তাঁর দেওয়া একটি রায়ের মাধ্যমে সামনে আনা তথ্য যেন খুলে দিল কিছু তথাকথিত নিরপেক্ষ ধর্মাবতারের মুখোশ! ফলে বেরিয়ে পড়লো এই দলদাস বিচার বিভাগীয় আধিকারিকদের আসল চেহারা! ফাঁস হয়ে গেছে দুর্নীতিগ্রস্তদের বাঁচাতে উদ্যোগীদের মুখোশের আড়ালে থাকা চরিত্র! স্বাধীন ভারতে এ কোন কঙ্কালসার বিচার ব্যবস্থার মুখাপেক্ষী দেশবাসী?

মহামান্য বিচারপতিদের মুখোশ খুলে পড়ার এই ঘটনা সত্যিই নজিরবিহীন! এই রাজ্যে এখন আইনের শাসন নয়, শাসকের আইন বলবৎ রয়েছে। রাজ্যের সাধারণ মানুষের শেষ ভরসাস্থল আদালত। কিন্তু দুর্ভাগ্য রাজ্যবাসীর, কারণ এই প্রভাবিত বিচার বিভাগ, এই অপরাধীদের পক্ষপাতিত্ব করে চলা এক শ্রেণীর মেরুদণ্ডহীন বিচারপতি বঞ্চিতদের ন্যায়বিচার প্রদানে অপারগ! পরিণামে রাজ্যের বিচার ব্যবস্থা যেন একটি প্রহসনে পরিণত হয়েছে। অবিলম্বে উপযুক্ত আইন মোতাবেক খোলনলচে বদল করে এই ব্যবস্থার আমূল সংস্কার প্রয়োজন।

—**অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়,**
দমদম, কলকাতা-৩০।

ভারতীয় জীবনে গৃহিণীর স্থান অনেক উচ্চে

সুতপা বসাক ভড়

বর্তমানে আমাদের সমাজে বেশ কিছু পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। সেগুলির মধ্যে কিছু পরিবর্তন আমাদের অভিপ্রেত, আবার কিছু অনভিপ্রেত। যেগুলি অনভিপ্রেত সেইগুলির উৎস সম্পর্কে আমাদের সচেতন হওয়া প্রয়োজন এবং যত শীঘ্র সম্ভব সেগুলিকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য আমাদের সচেষ্ট হতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা মনে রাখব যে, এই অনভিপ্রেত পরিবর্তনগুলি স্বাভাবিকভাবে বা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আমাদের সমাজে প্রবেশ করেনি; এগুলিকে জোর করে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এই ধরনের পরিবর্তনগুলি হলো যথেচ্ছ অসত্য কথন, সামান্য কারণে ঘরে অশান্তি, ধৈর্যের অভাব, বহির্মুখী জীবনযাত্রা, ব্যভিচার, ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব, সর্বোপরি আধ্যাত্মিকতা থেকে দূরে সরে যাওয়ার। প্রকৃতপক্ষে বেশ কিছু দেশের কুঅভ্যাস আমাদের সমাজে জোর করে ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে। তারা কিন্তু আমাদের দেশের তুলনায় শৈশবে অবস্থান করছে এবং তাদের সংস্কৃতির ভাণ্ডার শূন্য।

আমাদের গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে যে, ওই বিদেশি শক্তিগুলো কেন আমাদের পরিবার ও সমাজকে নষ্ট করার এই উদ্যোগ নিয়েছে। পাশ্চাত্যের দেশগুলি অর্থকেই জীবনের সবকিছু মনে করে। সবকিছুকে তারা কেবলমাত্র অর্থের পরিমাপে বিচার করে। সেজন্য ঘরে একটি ফ্রিজ, একটি টিভি, একটি ফোন থাকলে তো হবে না, যত বেশি সংখ্যায় পরিবার ভাঙবে, তত বেশি সংখ্যায় টিভি, ফ্রিজ, মোবাইল ফোন বিক্রি হবে, ব্যবসা বাড়বে, আর্থিক লাভ হবে। আবার আমরা দেখতে পাই যে মুঠোফোনের মধ্যে আমরা দিনের অনেকটা সময় কাটিয়ে দিচ্ছি, অথচ পরিবারের মানুষের সঙ্গে কম কথা বলছি। পৃথিবীতে আমরা প্রসারিত হয়ে চলেছি, অথচ পরিবারে আমরা সংকুচিত হয়ে চলেছি।

একটু আলাদাভাবে বিচার করলে আমরা দেখতে পাব যে, আমাদের বিপদের দিনে সবার আগে আমাদের পরিবার কাছে থাকে, তারপর বন্ধু ও বহির্জগৎ। এই পরিবারটিকে বড়ো যত্ন করে ধরে রাখতে হয়। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করার আগে একটু চিন্তা করা প্রয়োজন। এই পারিবারিক সম্পর্কগুলি অমূল্য এবং সংবেদনশীল গ্রন্থিগুলিকে সযত্নে পালন করেন ঘরের মহিলারা। এরজন্য মহিলাদের যথাযোগ্য সম্মান প্রাপ্য।

গৃহস্থের অর্থ গৃহবাসী। গৃহস্থ ধারণা আমাদের দেশের পরম্পরাগত অর্থাৎ মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি, নিকটাত্মীয় দ্বারা পরিবেষ্টিত একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। একই পরিবারের কয়েকজন একত্রে বসবাস করে, সমন্বিতভাবে কাজ করে, পরস্পরের ওপর নির্ভর করে, আধ্যাত্মিক অনুভবের সঙ্গে সহাবস্থান করে থাকে। ভারতীয় সংস্কৃতিতে এদের আমরা বলি গৃহস্থ এবং তাদের জীবনচর্যাকে গার্হস্থ্য বলা হয়েছে। প্রতিটি নর-নারীর জীবন এই গৃহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়ে থাকে। গৃহের কেন্দ্রে অবস্থান করেন গৃহিণী। তিনিই গৃহকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে থাকেন। স্বামী থাকে বাইরের কাজকর্মের দায়িত্বে। এই গৃহ, গৃহস্থ ও গৃহিণীর স্থান আমাদের সংস্কৃতিতে অতি উচ্চ স্থানে নির্ধারিত হয়েছে। ভারতীয় পরম্পরায় গৃহিণীর স্থান চিহ্নিত হয়ে আছে অত্যন্ত মর্যাদা, সম্মান ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে। মহাভারতে গৃহিণী সম্পর্কে মহামতি ভীষ্ম বলছেন :

'ন গৃহং গৃহমিত্যাহুঃ গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।
গৃহং হি গৃহিণীহীনং অরণ্যং সদৃশং মতম্।।'

অর্থ : গৃহ বলতে ইট-কাঠ দিয়ে তৈরি ঘর বোঝায় না। গৃহিণীই হলেন গৃহের সৃজনকর্ত্রী। গৃহিণী বিহীন গৃহ অরণ্যসদৃশ।

এই গৃহস্থ ধারণা ও আদর্শ বারবার তুলে ধরেছে আমাদের ধর্মগ্রন্থগুলি। ইতিহাস সাক্ষী, রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধের মূল কারণ ছিল গৃহলক্ষ্মীর অপমান, অবমাননা। সেজন্য গৃহিণীদের প্রতি আমাদের আচরণ মর্যাদাশীল হোক— এটাই আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের পরম্পরা। □

বন্ধ্যাত্ব ও হোমিও চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

গর্ভধারণে অক্ষম নারীকে বন্ধ্যা বলা হয়। অর্থাৎ সন্তান উৎপাদনে অক্ষমতা একটি শারীরিক ত্রুটি। এই সমস্যাটি কিন্তু স্বামী বা স্ত্রী উভয়েরই হতে পারে। বাস্তবে কিন্তু স্ত্রীকে দোষী করা হয়। সন্তানহীনতার জন্য পাড়া প্রতিবেশীর গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে পুরুষের বন্ধ্যাত্ব ৪০ ভাগ এবং মহিলা বন্ধ্যাত্ব প্রায় ৩৫। বন্ধ্যাত্বের অঙ্কে ব্যাখ্যাহীন ২৫ শতাংশ। পুরুষের সমস্যা চিরকাল ছিল।

এখন দেখা যাক বন্ধ্যাত্ব কী ? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্ধ্যাত্বের স্বরূপ না বুঝেই বাঁজা তকমা দেওয়া হয়। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত সংজ্ঞাটি হলো কোনো সুস্থ স্বাভাবিক দম্পতির ক্ষেত্রে টানা দু'বছর যাবৎ নিয়মিত অসুরক্ষিত যৌন সংসর্গের পরেও যদি স্ত্রীর গর্ভসঞ্চার সম্ভব না হয়, তখন তাকে বন্ধ্যাত্ব আখ্যা দেওয়া হয়। প্রথমে গর্ভধারণে সক্ষম না হলে তাকে প্রাইমারি ইনফার্টিলিটি এবং দ্বিতীয়বার গর্ভধারণে অক্ষম হলে তাকে সেকেন্ডারি ইনফার্টিলিটি বলে। এক্ষেত্রে গর্ভধারণ বলতে মিসক্যারেজ বা অন্য কোনো সমস্যা ছাড়াই পুরো সময়ের যে গর্ভধারণ বা ফুলটার্ম প্রেগন্যান্সির কথা বলা হচ্ছে।

বন্ধ্যাত্বের কারণ নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। একটি বিশেষ কিংবা অনেকগুলি দোষ বা কারণের ফলে বন্ধ্যাত্ব। বন্ধ্যাত্বের কারণ হিসেবে বেশি বয়সকেই দায়ী করা হয়। বিশেষত ৩৫ বছরের বেশি বয়সের মহিলাদের সবচেয়ে বেশি চিহ্নিত করেন চিকিৎসকরা। প্রজননতন্ত্রের কোনো গঠনগত বা শারীরবৃত্তীয় ত্রুটি থেকেও বন্ধ্যাত্বের সূত্রপাত। এছাড়া জিনগত কারণেও বন্ধ্যাত্বের সৃষ্টি হতে পারে। তেমনই হরমোন ঘটিত নানা অসুখবিসুখ (ডায়াবেটিস, থাইরয়েডের গণ্ডগোল, অ্যাড্রনাল ডিজিজ ইত্যাদি)। কিংবা পিটুইটারি গ্রন্থির সমস্যার কারণেও বন্ধ্যাত্ব এসে যায় দাম্পত্য জীবনে। পরিবেশের প্রভূত কুপ্রভাব পড়েছে বন্ধ্যাত্বের ক্ষেত্রে। কিছু উদ্বায়ী জৈব রাসায়নিক সিলিকন, কেমিক্যাল টক্সিন, কীটনাশক ইত্যাদি বিষাক্ত প্রভাব প্রজনন ক্ষমতা কমিয়ে দেয় তাৎপর্যপূর্ণভাবে। ধূমপানের প্রভূত নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। একজন অধূমপায়ীর চেয়ে একজন ধূমপায়ীর ঝুঁকিও এ ব্যাপারে ৬০ শতাংশ বেশি বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

স্ত্রী বন্ধ্যাত্বের সুনির্দিষ্ট কারণ : নারীদেহের জটিল গঠনতন্ত্রের ফলে নানাবিধ বন্ধ্যাত্ব দেখা দিতে পারে।

১. ওভুলেশন বা ডিম্বাণু নিঃসরণের সমস্যা। ঋতুচক্রের যে সময়ে ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু নির্গত হয়। সেই সময়ে সংসর্গ হওয়াটা গর্ভ সঞ্চারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় তাঁদের ডিম্বাশয় পূর্ণতা লাভ করে না এবং ডিম্বাণু নিঃসৃত হয় না। স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা বন্ধ্যাত্বের শিকার হন।

২. টিউবের সমস্যা, এন্ডোমেট্রিয়োসিস হলেও বন্ধ্যাত্বের ঝুঁকি থাকে ১০০ ভাগ। ফ্যালোপিয়ন টিউবের সংক্রমণ আপাত বা গঠনগত সমস্যা থাকলেও সন্তান ধারণে অসুবিধা হতে পারে।

৩. ৩৫ বছরের বেশি বয়সের মহিলাদের ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্বের আশঙ্কা বেশি।

৪. অত্যধিক বেশি বা কম ওজনের মহিলাদেরও গর্ভসঞ্চারের সমস্যা দেখা যায়।

৫. অপরিণত বয়সে যৌন সংসর্গ শুরু হলেও বন্ধ্যাত্বের আশঙ্কা থাকে।

পুরুষ বন্ধ্যাত্বের সুনির্দিষ্ট কারণ : পুরুষ দেহের গঠনতন্ত্র অপেক্ষাকৃত সরল হওয়ায় বন্ধ্যাত্বের কারণ খুব বেশি নেই। আপাত সংক্রমণ কিংবা জিনগত বা জন্মগত কারণে মূলত শুক্রাণুর নিকৃষ্ট গুণগত মান কিংবা অপর্যাপ্ত শুক্রাণুর সংখ্যাই বন্ধ্যাত্বের মূল কারণ। পর্যাপ্ত শুক্রাণু থাকলেও, তার সচলতা বা মোবিলিটি না থাকার কারণেও অনেক সময় পুরুষ বন্ধ্যাত্ব দেখা দিতে পারে।

উভয়ের বন্ধ্যাত্ব : স্বামী স্ত্রীর দুজনের বন্ধ্যাত্বের কারণে ১০ শতাংশ ক্ষেত্রে সন্তানের জন্ম দেওয়া অধরা থাকে। অনেক সময় দুজনেরই যেমন বন্ধ্যাত্ব থাকে তেমনি আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় এককভাবে স্বামী বা স্ত্রী হিসেবে হয়তো কেউই বন্ধ্যা নয়। অথচ দম্পতি হিসেবে সন্তান উৎপাদন সক্ষম। প্রায় ১৫ শতাংশ বন্ধ্যাত্বের কোনো নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা : আমার চিকিৎসক জীবনে বেশ কিছু বন্ধ্যা দম্পতির কোলে হোমিওপ্যাথির কল্যাণে সন্তান তুলে দিতে পেরেছি। থাইরয়েডের সমস্যা ছিল এমন মহিলাও। সন্তান ধারণে সক্ষম হয়েছিলেন। আবার যাদের হরমোন জনিত সমস্যা ছিল তাদের ক্ষেত্রে পিটুইটারিনাম দিয়ে সাফল্য পেয়েছি। আবার অনেক সময় যাদের বংশে টিউবারকুলারের ইতিহাস পেয়েছি তাদের ক্ষেত্রে আমি টিউবারকুলিনাম ওষুধ দিয়ে সুফল পেয়েছি। আবার গঙ্গাসাগরের একটি মহিলার ক্ষেত্রে বন্ধ্যাত্বের তেমন কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। নোনতা আবহাওয়ায় বসবাস করেন এই ভাবনার উপর নির্ভর করে ন্যাট্রাম মিউর ২০০ দিয়ে সাফল্য পেয়েছি, অপরদিকে পুরুষের শুক্রহীনতার ক্ষেত্রে টিউবারকুলিনাম এবং টেসটিস ওষুধ দিয়ে সুফল পেয়েছি। তাই হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা বন্ধ্যাত্ব নিরসনে সহায়ক।

মোদী বিরোধিতা থেকে রাষ্ট্র বিরোধিতা

রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠায় আজ উন্মোচিত একাধিক মুখোশ

অংশুমান গঙ্গোপাধ্যায়

হাজার বছর ব্যাপী পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ ভারতে শ্রীরামজন্মভূমি মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস প্রায় ৫০০ বছরের। বৈজ্ঞানিক মতে, ১২ দিন প্রভুর আজ্ঞা কঠোর ভাবে পালন করলে যে কেউ হয়ে ওঠেন তার প্রভুর আজ্ঞাবহ। আরব-তুর্কি-আফগান- মুঘল- ব্রিটিশ শাসনের দৌলতে হাজার বছর ব্যাপী দাসত্ব ভারতীয়দের মধ্যেই সৃষ্টি করেছে এমন একটি প্রজাতির যারা সভ্যতা- সংস্কৃতিগতভাবে অভারতীয়, যাদের জীবন পদ্ধতি বিদেশি রীতিনীতি অনুসারী, দার্শনিক দিক থেকে তারা রাষ্ট্রবোধহীন, ধর্মনিরপেক্ষ (অর্থাৎ, ধর্মবিবর্জিত বা ধর্মহীন), কিন্তু আকস্মিকভাবে একমাত্র জন্মসূত্রে তারা ভারতীয়। মুঘল-ব্রিটিশের উত্তরসূরি এই বাদামি চামড়ার সাহেবদের হাতে দেশ হয়েছে দ্বিখণ্ডিত। ছিন্নভিন্ন হয়েছে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জাতি। নির্যাতিত হয়েছে জনজাতি সমাজ। জাতি-বর্ণের ভিত্তিতে বিভাজিত হয়েছে হিন্দু সমাজ। দেশে আর্থিক বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্ষমতায়ন ঘটেছে দেশদ্রোহী, ভারত বিদ্বেষী, সন্ত্রাসবাদী, জেহাদি শক্তির। ভারতবাসীর মধ্যে দেশপ্রেমের সঞ্চার করা, রাষ্ট্রভক্তির বিকাশ, 'রাষ্ট্রহিত সর্বোপরি' এই ভাব জাগরণ এবং এক নতুন ভারতের নব উন্মেষ ঘটতে সময় লেগেছে ১৯৪৭-এর ক্ষমতা হস্তান্তর-রূপী স্বাধীনতা লাভের পর প্রায় সাতটি দশক। বিদেশি শাসক ও শাসন ব্যবস্থার তল্পিবাহক এই স্বাধীন ভারতের পূর্বতন শাসকদের আমলে দেশের আর্থিক বৃদ্ধি বাধা পেয়েছে, দেশের স্বাধীন বিদেশ নীতির অস্তিত্বও ছিল না বললেই চলে।

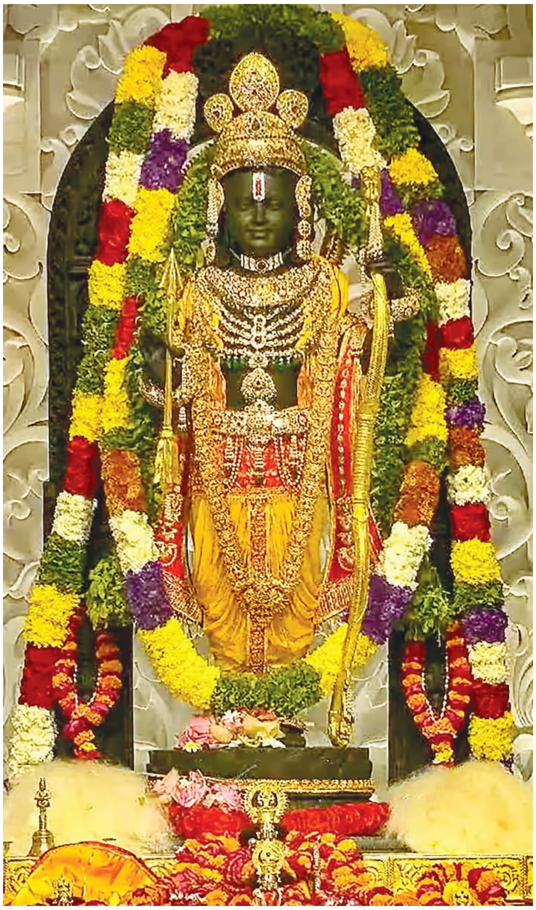

দীর্ঘকাল ব্যাপী বিদেশি শাসন, বিদেশি শাসক কুলের ধর্ম এদেশের মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ভয়াবহ প্রবণতা, যার পরিণামে পরাধীনতা ও ব্যাপক ধর্মান্তরণ— ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধ, ভারতের কৃষ্টি-সংস্কৃতিগত চেতনার ক্রমবিকাশকে ত্বরান্বিত হতে দেয়নি। এমনকী স্বাধীনতা লাভের পরেও তৎকালীন শাসকশ্রেণীর নির্বাচনী স্বার্থ চরিতার্থ করতে জেনারেল, এসসি-এসটি-ওবিসি ইত্যাদি একাধিক জাতিগত বিভাজনের মাধ্যমে জাতিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস হিন্দু সংখ্যাধিক্যের দেশ ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জনগোষ্ঠীকে কার্যত আত্মমর্যাদাবোধহীন, দেশের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করেছে। বিপ্রতীপে ভারতীয় স্বাভিমান প্রতিষ্ঠায়, জাতীয়তাবোধের সার্বিক জাগরণে, ভারতের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে দেশ জুড়ে গড়ে ওঠা সব চেয়ে বড়ো মাপের আন্দোলন --- অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলন। ১৫২৬ হতে প্রায় ৫০০ বছর ব্যাপী দেশের সাধু সমাজ, হিন্দু ও শিখ সম্প্রদায়ের বীর যোদ্ধাদের নিরন্তর প্রতিরোধ ও আত্মবলিদানে অসংখ্য বার লাল হয়েছে সরযূনদীর জল। স্বাধীনতা লাভের পর সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণ এবং ভগবান সোমনাথের প্রাণপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হলেও শ্রীরামজন্মভূমিতে বিতর্কিত ধাঁচার অপসারণ ও ভব্য রামমন্দির নির্মাণ থেকে যায় অধরাই। অগণিত রামভক্ত, জাতীয়তাবাদী যুব-সম্প্রদায়ের করসেবকের আত্মাহুতির পরিণামে শেষপর্যন্ত অপসারিত হয় পবিত্র শ্রীরামজন্মভূমির বুকে স্থাপিত কলঙ্কস্বরূপ সেই বিতর্কিত কাঠামো। আদালতের নির্দেশে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব

সর্বেক্ষণ (আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া)-এর দ্বারা পরিচালিত প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষা প্রমাণ করে বিতর্কিত ধাঁচা (পরবর্তীতে অপসারিত)-র নীচে প্রাচীন মন্দির ও সভ্যতার অস্তিত্ব। তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে বিদেশিদের লেখা ইতিহাসের প্রচার ও প্রসারে চিরব্রতী বামপন্থী ও ইসলামপন্থী ইতিহাসবিদদের তরফে হাজির করা তত্ত্ব ও ব্যাখ্যা। মাটির নীচ থেকে বেরিয়ে আসা জ্বলন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কারের পরিণামে শেষ হয় একটি যুগের, যেখানে কতিপয় বিদেশি পদলেহন ইতিহাসবিদের তরফে দায়ের করা হলফনামাকেই 'ইতিহাস' বলে স্বীকৃতিদেওয়ার রেওয়াজের ইতি টানা হয়। প্রাচীন মন্দির ধ্বংস করে সেই মন্দিরের কাঠামোকে ইসলামিক রূপ দিয়ে স্থাপত্যের চরিত্রগত পরিবর্তন করা হয়েছিল বলে রায়দান করে শীর্ষ আদালত। এই ঐতিহাসিক রায়ের ফলে পাঁচ শতাব্দী যাবৎ হিন্দুদের সেই ন্যায়সঙ্গত দাবির জয় হয়।

বর্তমানে ভারতে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন শাসক পক্ষের বিরুদ্ধে একজোট বিরোধীপক্ষ নানা ছল-বল-কৌশল অবলম্বনে দেশের জনতাকে করে চলেছে বিভ্রান্ত। কেন্দ্রীয় সরকারের অন্ধ বিরোধিতায় তাদের রাজনৈতিক অবস্থান হয়ে উঠেছে ভারত বিরোধী। ভারতকে টুকরো করার খেলায় মেতে ওঠা দেশদ্রোহী বাম, অতি বাম, জেহাদি শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কেন্দ্রবিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি সনাতন ধর্মকে শেষ করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কাজেও হাত দিয়েছে। সংখ্যাগুরু হিন্দু ভোট পাওয়ার লক্ষ্যে একদা নরম হিন্দুত্বের রাজনৈতিক তাস খেলা কংগ্রেস, শিবসেনা (উদ্ধব গোষ্ঠী) ছাড়াও ঘোষিত ভাবে হিন্দুবিদ্বেষী কমিউনিস্ট পার্টি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে নবনির্মিত রামমন্দিরের প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ। পুরোপুরি পরিবারতান্ত্রিক অন্যান্য বিরোধী দলগুলির তরফে এই অনুষ্ঠানকে বয়কট করা হয়েছে। শ্রীরামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার মহতী অনুষ্ঠানকে এই দলগুলি বয়কট করায় বেআব্রু হয়েছে তাদের রাজনৈতিক চরিত্র। নির্লজ্জ মুসলমান তোষণ, ভোটব্যাংকের রাজনীতি এবং জাতি-বর্ণ- সম্প্রদায়ের বিভাজনের রাজনীতি করা এই দলগুলির তরফে দেশের সংখ্যাগুরু সমাজের ভাবাবেগকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি, উলটে তাদের সংখ্যালঘু ভোটব্যাংককে বার্তা পাঠানোর কাজ অব্যাহত থেকেছে।

এই সব কিছুর সঙ্গে কতিপয় ধর্মগুরু স্থানীয় ধর্মাচার্যদের কিছু মন্তব্যও সামনে এসেছে। যদিও শ্রীরামজন্মভূমি পুনরুদ্ধারে গত তিন দশক ব্যাপী সংঘটিত গণ-আন্দোলনে, সেই সংক্রান্ত আইনি লড়াইতে তাঁদের কী ভূমিকা ছিল সেই প্রশ্নও যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। শ্রীরামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার এই দিব্য অনুষ্ঠানের বিরোধিতায় তাঁদের পক্ষে তোলা একাধিক যুক্তি প্রকৃতপক্ষে সারবত্তাহীন, অর্থহীন এবং পরোক্ষে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সনাতন ধর্মের প্রচার-প্রসারে যাদের একমাত্র হাতিয়ার ব্রাহ্মণ্যবাদ, তাঁদের তরফে উপস্থাপিত যুক্তিসমূহ ধর্ম সংস্থাপনার ক্ষেত্রে যে ভিত্তিহীন পরিগণিত হবে তা বলাই বাহুল্য। অদ্ভুত ব্যাপার হলো এই ব্রাহ্মণ্যবাদ-বিরোধী মতাদর্শের স্বঘোষিত ধারক-বাহক বামপন্থী দলগুলির মুখপাত্রদের তরফে সম্প্রতি বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে রামমন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানকে খোঁচা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই বিশেষ ধর্মগুরুদের অনুপস্থিতির উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্ম বা জিরাফ কোনোটাতেই না থাকা, দেশ থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদকে সমূলে উৎপাটনের 'কসম' খাওয়া বামপন্থীদেরও মুখ বাঁচাতে এহেন প্রসঙ্গের শরণাপন্ন হতে হচ্ছে। এহেন যুক্তির অবতারণা করতে হচ্ছে। আত্মগরিমা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাপৃত সংগ্রামে নতুন ভারতের এও একটি জয় বই কী!

উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিংহ যাদবের নির্দেশে নিরীহ, শান্তিপূর্ণ করসেবকদের নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা, বিতর্কিত ধাঁচা অপসারণের পর কুখ্যাত সন্ত্রাসবাদী দাউদ ইব্রাহিমের কষা ছকে আরডিএক্স জাতীয় বিস্ফোরক ব্যবহার করে মুম্বই জুড়ে ধারাবাহিক বিস্ফোরণের মতো ভয়াবহ সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনা, গুজরাটের গোধরায় ট্রেনের বগিতে আগুন লাগিয়ে, পাথর ছুঁড়ে করসেবকদের হত্যার মতো ঘটনা, বীরগতিপ্রাপ্ত করসেবকদের স্মৃতি ভারতবাসী ভোলেনি, ভুলবে না।

রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার আগেই কেরালা সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী কেরালা জুড়ে ২২ জানুয়ারি বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যাহত হওয়ার আগাম ঘোষণা, রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর কেরালার মুখ্যমন্ত্রীর তরফে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' রক্ষার ডাক তামিলনাড়ু জুড়ে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্দিরে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও কার্যক্রমের অনুমতি না দেওয়া, এমনকী ব্যক্তিগত মালিকানাধীন মন্দিরগুলিকেও সরকারি তরফে হুমকি দেওয়া, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে কলকাতায় সংহতি মিছিল প্রমাণ করে যে এই হিন্দুবিদ্বেষী রাজনৈতিক দলগুলি শুধু রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান বয়কট করেই ক্ষান্ত থাকেনি, আপামর হিন্দু সমাজের সেন্টিমেন্টে আঘাত দিতে তারা সদা তৎপর। অগণতান্ত্রিক আচার-আচরণে বাস্তবিকভাবে তারা আজ ভারতের বুকে রাজনীতি করার, হিন্দুদের দ্বারে গিয়ে ভোট ভিক্ষার যাবতীয় অধিকার হারিয়েছে। তাদের এই ধ্বংসাত্মক রাজনীতির পরিণামে তাদের পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাওয়া সময়ের অপেক্ষা! শ্রীরামজন্মভূমি আন্দোলনে যোগদান না করা, রামমন্দির নির্মাণের বিরোধিতা এবং ওই স্থলে মসজিদ নির্মাণের পক্ষে সওয়াল করে চলা এই দলগুলির সামনে শেষ সুযোগ ছিল রামলালার

প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিনের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে অতীতের পাপস্খালন ও প্রায়শ্চিত্ত করার। কিন্তু অন্যান্য বারের মতোই ভারত বিদ্বেষীদের মনে এই শুভবুদ্ধির উদয় ঘটেনি। রামমন্দির নির্মাণকে তারা সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টির প্রচেষ্টা বলেও আখ্যা দেয়। বাস্তবে রাষ্ট্রপুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের অধিষ্ঠান স্থল এই নবনির্মিত ভব্য রামমন্দির এই অমৃত কালে জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতীক এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও অস্মিতার দ্যোতক। ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর, সুপ্রিম কোর্টের রায়দানের আগে তারা প্রচার করে যে হিন্দুদের পক্ষে এই রায় গেলে দেশ হয়ে উঠবে অশান্ত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জর্জরিত হবে সমগ্র দেশ! তাদের সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী আগেই ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে।

গত ২২ জানুয়ারি, মুম্বইয়ের মীরা রোড ও থানেতে হিন্দুদের যানবাহনের ওপর আক্রমণ চালায় জেহাদিরা। তাড়া করে অনেক হিন্দুকে গাড়ি থামাতে বাধ্য করা হয়, গাড়ি থামিয়ে সেই গাড়িগুলিতে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়, হিন্দু নর-নারীদের শারীরিক ভাবে নিগ্রহ করা হয়। গুজরাটেও কয়েকটি জায়গায় শান্তিপূর্ণ হিন্দুদের ওপর চলে হামলা। পার্ক সার্কাসের সভা থেকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যারা তাকে ভোট দেবেন না বা তাকে সমর্থন করবেন না, তাদের 'কাফের' আখ্যা দেন। ২৪ জানুয়ারি সামাজিক মাধ্যমে হাওড়া শহরে একটি শিবমন্দির ভাঙচুর, কিছু এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি ও পুলিশ মোতায়েনের খবর ও ছবি ছড়িয়ে পড়ে।

এই রাজনৈতিক শক্তিগুলির তরফে এর আগে আদালতে এফিডেভিট দিয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে কাল্পনিক চরিত্র আখ্যা দেওয়া, উন্নয়নের নামে রামসেতুকে ভেঙে ফেলার পরিকল্পনা, এমনকী ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনকে প্রভাবিত করতে পারে বলে দাবি করে ভোটের আগে শ্রীরামজন্মভূমি মামলার রায়দানে বিরত থাকার বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদনের মতো একাধিক ষড়যন্ত্র সংগঠিত হয়েছে। গত কয়েক দশকের রাজনৈতিক ধারাপাত এবং সাম্প্রতিককালে ঘটে চলা সব ঘটনার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় অনবরত খুলে যাচ্ছে একাধিক মুখোশ। দীর্ঘদিন ধরে সৃষ্টি হওয়া এক ভ্রমজালের গহ্বর থেকে যেন ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে নতুন ভারত। স্বঘোষিত দেশবিরোধী শক্তিগুলির উগ্র ভারত বিরোধী শক্তিতে পরিণত হওয়া, অতীতে নরম হিন্দুত্বের রাজনৈতিক রুটি সেঁকা দলগুলির তরফে ক্রমাগত বিষ উগড়ে দেওয়ার সেকুলার প্রবণতা বা জেহাদিদের মধ্যে একটা প্রতিশোধস্পৃহার আগুন জ্বালিয়ে, তাদের ঈমান রক্ষার লড়াইতে শামিল করে গাজওয়া-এ-হিন্দের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তাদের দিয়ে হিন্দু সমাজের ওপর আক্রমণ নামিয়ে আনা বা সন্ত্রাসবাদী হানার মতো বাস্তবতা ও ষড়যন্ত্রের ছক উন্মোচিত করছে একাধিক মুখোশ। বেআব্রু হচ্ছে মুখোশের আড়ালে থাকা একাধিক চরিত্র। বুদ্ধিজীবীর মুখোশধারী একদল ইতিহাসবিদ ভণ্ড ও ইতিহাসবোধহীন প্রমাণিত হয়েছেন আগেই। এমনকী ধর্মগুরুর সিংহাসনে আসীনরাও রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থেকে যেন প্রমাণ করে দিলেন অনেক কিছুই। এই সব রামবিরোধী তথা রাষ্ট্রবিরোধী শক্তির থেকে সতর্ক ও সচেতন হওয়ার সময় হয়েছে। তাদের প্রত্যাখ্যান করার সময় এসেছে। ■

হিন্দু বিরোধীরা শ্রীরামের জন্মস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন

ভারতের সর্বোচ্চ আদালত যোগ্য জবাব দিয়েছে

বিনয়ভূষণ দাশ

দীর্ঘ পাঁচশো বছরের প্রতীক্ষার পরে অবশেষে গত ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় শ্রীরামমন্দিরের শুভ উদ্বোধন ও রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা হলো। দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ এবং সমাজের বিশিষ্টজনেদের উপস্থিতিতে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রামমন্দিরের শুভ উদ্বোধন করলেন।

দীর্ঘ সওয়াল-জবাবের পরে দেশের শীর্ষ আদালত 'রামজন্মভূমি- বাবরি মসজিদ' বিতর্কের রায় দিয়েছে ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর। নিষ্পত্তি হয়েছে কয়েক শতকের বিবাদের। এই রায়ে আপাতদৃষ্টিতে সকলপক্ষই সন্তুষ্ট। রামভক্তদের দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে আজ এক সুদৃশ্য রামমন্দির নির্মাণ হয়েছে। কিন্তু শ্রীরাম বিরোধীরা এখনও মেনে নিতে পারছে না এই সত্যকে। কেউ কেউ বলছে, আরে রাম রাম, তাও হয় নাকি, ওটা যে মসজিদ! কেউ বলছে, 'তথ্যপ্রমাণকে হারিয়ে জয় হয়েছে বিশ্বাসের' ইত্যাদি। কোনো কোনো সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা ভরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই রায়ের বিরোধিতায়। কিন্তু দেশের বেশিরভাগ মানুষ চাইছিলেন, একটা স্থিরতা আসুক। কিন্তু একশ্রেণীর মানুষের কথায় মনে হচ্ছে, তাঁরা শান্তি চান না; অশান্তি জিইয়ে রাখতেই বোধহয় তাঁদের মনের শান্তি, প্রাণের আরাম। বিশেষ করে তৎপর হয়ে উঠেছে কিছু বামমার্গী, আলিগড়পন্থী ঐতিহাসিক এবং রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তি। কোনো স্বঘোষিত শিল্পী ঐতিহাসিক আবার এমনও লিখেছেন, 'দেখা যাচ্ছে, বহু হিন্দু মন্দিরই তৈরি হয়েছিল বৌদ্ধ মন্দির বা তার ধ্বংসস্তূপের ওপর।' ভদ্রলোক এ তথ্য কথায় পেলেন তার কোনো হদিস দেবার প্রয়োজন বোধ করেননি। উনাকে বলব, ড. বি.আর আম্বেদকরের লেখা পড়ুন। আম্বেদকর পরিষ্কার বলেছেন, বেশিরভাগ বৌদ্ধ মঠ, মন্দির ইসলামি আক্রমণকারীরা ধ্বংস করেছে এবং তার উপর মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। শ্রীরাম ওখানেই জন্মেছিলেন তার কোনো প্রমাণ আছে কি বলে শোরগোল তুলেছেন চিরকালীন ভারতীয় ঐতিহ্যবিরোধী কিছু বামমার্গী বুদ্ধিজীবী। কিন্তু তাঁদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, যিশুখ্রিস্ট বেথলেহেমের ঠিক কোথায় জন্মেছিলেন, কবে জন্মেছিলেন তার কোনো প্রামাণ্য দলিল বা প্রত্নতাত্ত্বিক কোনো প্রামাণ আছে? অথবা হজরত মহম্মদ কোথায় জন্মেছিলেন তার কোনো প্রমাণ্য দলিল অথবা কোনো পাথুরে প্রমাণ আছে? ওঁরা রে রে করে উঠবেন! দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশ্বাস করে, শ্রীরাম ওই ভূমিতেই জন্মেছিলেন; ওখানে তাঁর মন্দির ছিল। এটা হিন্দুদের স্বাভিমানের কথা।

অবিশ্বাসীদের অবিশ্বাস ভঞ্জন করার হয়তো খুব একটা প্রয়োজন নেই; তবুও এই প্রসঙ্গে রামজন্মভূমির ঐতিহাসিকতা নিয়ে

আলোচনা করা যাক অবিশ্বাসীদের জন্য। প্রথমে রামজন্মভূমির ধর্মীয় প্রেক্ষাপট নিয়ে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া দরকার। আমাদের দেশে শ্রীরাম হলেন হিন্দুদের পরমারাধ্য দেবতাদের একজন। তাঁকে ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার হিসেবে গণ্য করা হয়। রামায়ণ অনুযায়ী, শ্রীরাম অযোধ্যার রাজা দশরথের জ্যেষ্ঠপুত্র; জন্মেছিলেন রাজধানী অযোধ্যায়। আবার গরুড় পুরাণ অনুযায়ী, অযোধ্যা হলো সাতটি 'মোক্ষ' প্রদায়িনী নগরীর একটি। 'অযোধ্যা মাহাত্ম্য' নামে একাদশ শতকে সংকলিত এক গ্রন্থে 'জন্মস্থান' নামাঙ্কিত এক স্থানকে রামের জন্মস্থান হিসেবে চিহ্নিত করে বলা হয়েছে, স্থানটি এক পবিত্র তীর্থস্থান। অযোধ্যা এবং তার আশপাশের স্থানগুলিকে নিয়ে 'রামদুর্গ' নামে একটি দুর্গশহর গড়ে তোলা হয়েছিল।

ঐতিহাসিকভাবেও অযোধ্যা শহরটি বিখ্যাত ছিল গুপ্তযুগ থেকেই। গৌতম বুদ্ধের সময়ে, খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ সালে নগরটি 'সাকেত' নামে পরিচিত ছিল এবং তা উত্তর ভারতের ছয়টি বড়ো শহরের অন্যতম ছিল। গুপ্তরাজত্বের সময়ে কুমারগুপ্ত স্থানটিকে সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে মনোনীত করেছিলেন। কথিত , মহাকবি কালিদাস এখানেই তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'রঘুবংশম' রচনা করেন। ফ্রান্সিস বুকানন এবং অ্যালেক্সান্ডার কানিংহামের মত অনুযায়ী, রামের স্বর্গারোহণের পরে স্থানটি পরিত্যক্ত হয় এবং গুপ্তরাজ বিক্রমাদিত্য পরে স্থানটি আবার পুনরুজ্জীবিত করেন। আবার কালিদাসের রঘুবংশমের মতে, স্থানটি পুনরুজ্জীবিত করেন রামের পুত্র কুশ। গুপ্তরাজাদের পরে ক্ষমতায় আসেন গাড়োয়াল বংশীয় রাজারা। এই বংশের রাজারা অনেক বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করেন যার মধ্যে পাঁচটি আওরঙ্গজেবের সময় অবধি টিকে ছিল। আওরঙ্গজেব সেগুলি ধ্বংস করে। ভারততত্ত্ববিদ হ্যান্স টি বেকার মন্তব্য করেছেন যে, রামজন্মভূমিতে গাড়োয়াল রাজাদের নির্মিত একটি মন্দির অবস্থিত ছিল। স্থানীয় হিন্দুদের বিশ্বাস, অধুনা বিলুপ্ত বাবরি ধাঁচার স্থলেই শ্রীরাম জন্মেছিলেন। আর রামজন্মভূমির স্থানেই ১৫২৮-২৯ খ্রিস্টাব্দে মোগল আক্রমণকারী বাবরের সেনাপতি মির বাকি (বাকি তাসখন্দি) মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ নির্মাণ করে। ১৬১১ খ্রিস্টাব্দে ইংরাজ পর্যটক উইলিয়াম ফিঞ্চ অযোধ্যা ভ্রমণ করে লিপিবদ্ধ করে গেছেন যে, স্থানটি ছিল রামচাঁদ বা রামচন্দ্রের প্রাসাদ এবং গৃহের ধ্বংসাবশেষ। উল্লেখ্য , এক্ষেত্রে তিনি কোনো মসজিদের উল্লেখ করেননি। ১৬৩৪ সালে টমাস হারবার্ট বর্ণনা করেছেন, স্থানটিতে একটি 'অপূর্ব প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ' বিরাজমান ছিল। ১৫২৮ থেকে ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দ অবধি প্রাপ্ত কোনো নথিপত্রে ওই স্থানে কোনো মসজিদের উল্লেখ নেই। ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে রাজপুত রাজা সওয়াই জয় সিংহ উল্লিখিত স্থান ও তার আশপাশের জায়গা কিনে নেন। তাঁর দলিল- দস্তাবেজেই প্রথম একটি তিন গম্বুজবিশিষ্ট একটি কাঠামোর উল্লেখ পাওয়া যায়; কিন্তু সেটি উল্লিখিত হয়েছিল 'জন্মস্থান' বা 'ছঠী' হিসেবে, মসজিদ হিসেবে নয়। স্থানটির প্রশস্ত প্রাঙ্গণে উঁচু ভিত্তি বা প্লাটফর্ম ছিল যেখানে হিন্দুরা পূজা করতেন। রামজন্মস্থানের জমির স্বত্ব অর্পিত করা হয়েছিল দেবতার প্রতি অর্থাৎ জন্মস্থানটি ছিল 'দেবত্র' সম্পত্তি। আর এই মালিকানা ১৭১৭ থেকেই মুঘল বাদশাহদের স্বীকৃত। এসমস্ত তথ্যই জেসুইট পাদরি জোসেফ টিফেনফেলার সঠিক বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন, "that once upon a time, here was a house where Beschan (Bishnu) was born in the form of Ram." উল্লেখ্য যে, জোসেফ টিফেনফেলার ১৭৬৬-১৭৭১-এর মধ্যে অযোধ্যা ভ্রমণ করেছিলেন। ১৮১০ সালে ফ্রান্সিস বুকানন অযোধ্যা ভ্রমণ করেছিলেন। তিনিও লিখেছেন, যে কাঠামো ভেঙে মসজিদ গড়া হয়েছিল সেটি রামের স্মৃতিতে তৈরি মন্দির। পরবর্তীকালের অনেক 'আকর' গ্রন্থ থেকেই জানা যায় যে একটি মন্দির ভেঙে তার স্থলে কথিত ধাঁচাটি নির্মাণ করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দের আগে অবধি মন্দির ভেঙে বাকি মীরের তৈরি ধাঁচাটিকে 'মসজিদ-ই-জন্মস্থান' নামে অভিহিত করা হতো। এমনকী সরকারি দলিল যেমন রাজস্ব বিভাগের কাগজপত্রতেও। বাস্তবে মধ্যযুগে বেশিরভাগ মসজিদ তৈরি হয়েছিল হিন্দু মন্দির ভেঙে। সবই জবরদখল করা। ফলে কোনো

ফঃ৪

মসজিদেরই পক্ষে কোনো দলিল-দস্তাবেজ থাকার কথা নয়; হয়েছেও তাই। উচ্চতম বিচারালয়ে তাই মসজিদের জমির পক্ষে কোনো দলিল-দস্তাবেজ দেখাতে পারেনি বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটি।

ঐতিহাসিক শেখ আজামত আলি কাকোরাওয়ি নামে (১৮১১-১৮৯৩) তাঁর গ্রন্থ 'তারিখ-ই-অওয়োধ' এ বলেছেন, "The Babari mosque was built up in 923 A.H.under the patronage of Sayyid Musa Ashiqanin in the Janmasthan temple in Faizabad-Avadh, which was a great place of worship and capital of Ram's father." এইচ আর নেভিল তাঁর সম্পাদিত Faizabad District Gazetteer (1905) এবং Barabanki District Gazetteer -এ লিখেছেন যে জন্মস্থান মন্দির "was destroyed by Babur and replaced by a mosque." তিনি আরও লিখেছেন, "The Janmasthan was in Ramkot and marked the birthplace of Rama. In 1528 A.D. Babur came to Ayodhya and halted here for a week. He destroyed the ancient temple and on its site built a mosque, still known as Babur's mosque. The materials of the old structure (i.e. the temple) were largely employed, and many of the columns were in good preservation." মৌলবি আব্দুল করিমের লেখা পার্সিয়ান পুস্তকেও রাম জন্মস্থান মন্দির ভেঙে সেই স্থানে বাবরি মসজিদ গঠনের কথা বলা হয়েছে। আবার আকবরের সভাসদ ও আকবরনামার লেখক আবুল-ফজল-ইবন-মুবারক ১৫৯৮-এ লেখা আইন-ই-আকবরিতে অযোধ্যায় 'জন্মদিন উৎসব' অর্থাৎ 'রামনবমী' উৎসব, রামের বাসস্থান, পবিত্রতম স্থান ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করেছেন অযোধ্যা সম্পর্কে। কিন্তু তিনিও কোথাও কোনো মসজিদের কথা উল্লেখ করেননি। শুধু তাই নয়, ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহের সময় অযোধ্যার নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ ওই বিদ্রোহে হিন্দুদের সমর্থনের শর্তে হিন্দুদের শ্রীরামমন্দির ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। ঘটনাক্রমে মুসলমানদের ভারতে আগমনের পরে এই প্রথম কোনো ইসলামি শাসক হিন্দুদের সমর্থনের বিনিময়ে তাঁদের কোনো ধর্মস্থান ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব দেন, যদিও তা বাস্তবায়িত হয়নি। মুসলমানরা বহিরাগত হলেও হিন্দুরা তাঁদের বিভিন্ন সময়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে বারে বারে, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে লাখে লাখে। ১৭১৭, ১৮৫৩, ১৮৫৫, ১৮৫৯, ১৮৮৩, ১৯৪৯, ১৯৮০ ..... স্থানীয় হিন্দুরা বার বার চেষ্টা করেছে রামমন্দির পুনরুদ্ধার করে সেখানে এক অপূর্ব মন্দির তৈরি করতে। এমনকী শাহ গোলাম হুসেনের নেতৃত্বে মুসলমানরা ১৮৫৫ সালে এক যুদ্ধে বৈরাগী সৈন্যদের কাছে শোচনীয়ভাবেও হেরে যায় হনুমানগঢ়ীস্থিত তথাকথিত মসজিদ দখল করতে গিয়ে। এই সময়ে অযোধ্যার নবাব ছিলেন ওয়াজিদ আলি শাহ। তিনি হিন্দু, মুসলমান ও ইংরাজ প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটিও গড়েন এই বিবাদ মেটাতে। যদিও কমিটি তাঁদের রিপোর্টে ওখানে মন্দিরেরই অবস্থানের পক্ষে মত দেয়। হিন্দুদের প্রতিরোধের ফলে ওয়াজিদ আলি শাহ এব্যাপারে আর এগোননি। আবার ১৯৪৬ সালে অখিল ভারতীয় রামায়ণ মহাসভা বিক্ষোভ-আন্দোলন শুরু করে 'জন্মস্থান' ফিরে পেতে। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে গোরক্ষনাথ মঠের মহান্ত দিগ্বিজয় নাথ পূর্বোক্ত রামায়ণ মহাসভায় যোগদান করেন এবং একনাগাড়ে ন'দিন ধরে 'রামচরিত মানস' পাঠের ব্যবস্থা করেন। এই সময়েই, ২২ ডিসেম্বর, ১৯৪৯ সালে রামলালা আবির্ভূত হয় বলে কথিত। সেকুলার বলে কথিত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু ফৈজাবাদের জেলাশাসককে ওই মূর্তি সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেন। কিন্তু ফৈজাবাদের তৎকালীন জেলাশাসক কে কে নায়ার. গণ্ডগোলের আশঙ্কায় নির্দেশ কার্যকরী করেননি। ফলে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়।

মোটের উপর হিন্দুরা বারবার রাম জন্মভূমি উদ্ধারে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছেন বহিরাগত ইসলামি শাসক এবং ব্রিটিশর দ্বারা। হিন্দুদের এই যুদ্ধ এবং মন্দির পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ও আত্মত্যাগের ঘটনা বামপন্থী ঐতিহাসিকেরা চেপে গিয়েছেন সর্বদা। হিন্দু স্বাভিমানের ইতিহাস অকথিত থেকে গেছে। রামশরণ শর্মা, ইরফান হাবিব, মহম্মদ হাবিব, রোমিলা থাপার প্রভৃতি ঐতিহাসিক এই ইতিহাসকে বিকৃত করেছে। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সবাই উচ্চতম বিচারালয়ের রায় বিনাবাক্যে মেনে নিয়েছেন। কিন্তু স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীদের এই রায় কিছুতেই যেন হজম হচ্ছে না।

অথচ, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে, বিচারালয়ের নির্দেশে ১৯৭০, ১৯৯২, ২০০৩ ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বিভাগ রামজন্মভূমিস্থলে খননকার্য চালিয়ে তথাকথিত মসজিদের নীচে নানা পুরাতাত্ত্বিক প্রমাণ পেয়েছে। ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, দশম শতকের উত্তর ভারতীয় গঠনশৈলীর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে ঐ মসজিদের নীচে যাতে প্রমাণিত হয় যে এক বিশাল মন্দিরচত্বর অবস্থিত ছিল মসজিদের নীচে। বি বি লাল, কে. কে. মুহাম্মদ ইত্যাদি পুরাতাত্ত্বিকরা ওই জমির নীচে মন্দিরেরই ধ্বংসাবশেষ আছে বলে তাঁদের রিপোর্টে উল্লেখ করেন। সুপ্রিম কোর্ট তাঁর এই রিপোর্ট মেনে নিয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, পুরাতাত্ত্বিক রিপোর্ট, পর্যটকদের বিবরণ, মধ্যযুগের বিভিন্ন ইসলামি লেখকদের বিবরণ, বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র সমস্তই ওই স্থানে একটি হিন্দু মন্দিরের অবস্থিতি জোরালোভাবে প্রমাণ করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হিন্দুদের আজন্মলালিত বিশ্বাস। প্রমাণ ও বিশ্বাস এখানে একে অপরের পরিপূরক। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা তাই সর্বসম্মত রায় দিয়েছেন রামলালা বিরাজমানের পক্ষে এবং তিন মাসের মধ্যে একটি সমিতি গড়ে তাঁদের মাধ্যমে এক অপূর্ব রামমন্দির নির্মাণ করতে।

কোর্টের রায়ের ফলশ্রুতিতে এবং সাধুসন্ত এবং দেশের সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এক অনিদ্যসুন্দর রামমন্দির নির্মিত হয়েছে। আজ দেশের সমস্ত মানুষ খুশি এই মন্দির পুনঃপ্রতিষ্ঠায়। দেশের বিশাল হিন্দুসমাজ ভারতীয় যুক্তিশীল ঐতিহ্যের প্রতি যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করবেন। রামমন্দির হিন্দু স্বাভিমানের প্রতীক। শ্রীরামের জন্মস্থান নিয়ে প্রশ্ন ওঠানো বামপন্থী ঐতিহাসিক ও বুদ্ধিজীবীদের যোগ্য জবাব দিয়েছে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত। তাদের লজ্জা নেই এরপরও তারা রামবিরোধিতা চালিয়ে যাচ্ছেন। ■

সক্ষম দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের তৃতীয় রাজ্য সম্মেলন

সক্ষম হলো দিব্যাঙ্গদের স্বাবলম্বী করার জন্য নিবেদিত একটি জাতীয় সংগঠন। চিকিৎসাশাস্ত্রে বর্তমানে ২১ রকমের শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতার পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে সক্ষম দক্ষিণবঙ্গ দিব্যাঙ্গজনদের সেবায় নিয়োজিত এবং তাদের সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতে ফেরাতে বদ্ধপরিকর। গত ২৯ জানুয়ারি সক্ষম দক্ষিণবঙ্গের তৃতীয় রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কলকাতা সল্টলেকস্থিত ঐক্যতান সভাগৃহে।

প্রদীপ প্রজ্বলন এবং ভারতমাতা, ঋষি অষ্টবক্র ও সন্ত সুরদাসের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়। সম্মাননীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সক্ষমের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কমলাকান্ত পাণ্ডে, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. জয়ন্ত রায়চৌধুরী এবং আশাভবনের অধিকর্তা জন মেরী বাড়ুই।

সক্ষম দীর্ঘদিন ধরে দিব্যাঙ্গজনদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকারের কাজ করে চলেছে। এবার সংগঠনের অধ্যক্ষ পদে মনোনীত হলেন বিশিষ্ট মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অরবিন্দ ব্রহ্ম। তিনি বলেন, এই সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেক দিব্যাঙ্গবন্ধুর আত্মশ্রদ্ধা সুনিশ্চিত করা। তাদের সামাজিক অন্তর্ভুক্তীকরণ এবং খুব শীঘ্র দিব্যাঙ্গ সেবা কেন্দ্র গঠন করা হবে। কমলাকান্ত তাঁর ভাষণে বলেন, সক্ষম দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করে বাকিদের মতো বিশেষভাবে সক্ষম বিদ্যাঙ্গজনেরাও সমাজ ও দেশ গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। বিদ্যাঙ্গজনদের প্রতি সমস্তরকম বৈষম্য দূর করার ওপর তিনি জোর দেন। অনুষ্ঠানে দিব্যাঙ্গ ভাই-বোনেদের সুবিধার জন্য UDID কার্ড তৈরির জন্য একটি গুগল ফর্মের সূচনা করা হয়।

সম্মেলনে বিভিন্ন বক্তা দিব্যাঙ্গজনদের জন্য সরকারের সদর্থক ভূমিকার প্রশংসা করেন। দিব্যাঙ্গজনদের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করার কথা আলোচনা হয়। UDID এবং অন্যান্য সরকারি পরিষেবা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন সন্তোষ কুমার, ডাঃ সনৎ কুমার রায়, ডাঃ উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিব্যাঙ্গজন এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একটি সচেতনতা র‍্যালি করা হয়। দিব্যাঙ্গজন বন্ধুদের পরিবেশিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি উপস্থিত সকলকে মুগ্ধ করে। অনুষ্ঠানে প্যারা অলিম্পিক ২০২৩ বার্লিন অংশগ্রহণকারীদের সম্মানিত করা হয়। ধন্যবাদসূচক সমাপ্তি ভাষণ রাখেন সক্ষম দক্ষিণবঙ্গে সহসভাপতি ডাঃ তরুণ কুমার সরকার। বন্দেমাতরম গীতের পর সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ভগিনী নিবেদিতা স্মৃতি সেবা প্রকল্পের প্রেরণা সভা

ভগিনী নিবেতির ভারত পদার্পণ উপলক্ষ্যে গত ২৮ জানুয়ারি ভগিনী নিবেদিতা স্মৃতি সেবা প্রকল্পের উদ্যোগে স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের রামকৃষ্ণ মঞ্চ প্রেক্ষাগৃহে প্রেরণা সভার আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে এদিন দুপুর ২টায় একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা উত্তর কলকাতার বাগবাজার স্থিত নিবেদিতা পার্ক থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে স্বামী বিবেকানন্দের বসতবাটিতে পৌঁছয়। প্রেরণা সভায় সভানেত্রীর আসন অলংকৃত করেন কলকাতা নিউ আলিপুর শ্রী সারদা আশ্রম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা প্রব্রাজিকা বিদ্যাপ্রাণা মাতাজী। উপস্থিত ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা সেবা প্রকল্পের অধ্যক্ষা শ্রীমতী মহুয়া ধর, ব্রহ্মচারিণী প্রণতি দিদি। মুখ্য বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির অখিল ভারতীয় সহ কার্যবাহিকা শ্রীমতী সুলভাতাঈ দেশপাণ্ডে। ছিলেন রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির আর একজন অখিল ভারতীয় সহ কার্যবাহিকা শ্রীমতী সুনীতা হলদেকর এবং পূর্বক্ষত্র প্রচারিকা লতিকা পাঢ়ী। 'সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং' সংগঠন মন্ত্রে সভার শুভারম্ভ হয়। স্বাগত ভাষণ দেন সেবিকা সমিতির প্রান্ত বৌদ্ধিক প্রমুখ শ্রীমতী শিবানী চট্টোপাধ্যায়। শর্মিষ্ঠা রায়ের কণ্ঠে এককগীতের পর মুখ্য বক্তা তাঁর ভাষণ প্রদান করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রান্ত সহ বৌদ্ধিক প্রমুখ শ্রীমতী মৌমিতা বর এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন প্রান্ত কার্যবাহিকা শ্রীমতী মৌসুমী কর্মকার। রাষ্ট্রগীতের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

ধনেখালিতে পারলৌকিক ক্রিয়ায় সামাজিক রূপ দান

হুগলী জেলার ধনেখালি নিবাসী বিশিষ্ট অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অরূপ কুমার দাসের মাতৃদেবী সন্ধ্যারানি দাসের পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মকে সামাজিক রূপ দান করা হলো। গত ২৩ জানুয়ারি তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে ৩০ জন রক্ত দান করেন। তারমধ্যে বেশ কয়েকজন মহিলা ছিলেন। রক্তদাতাদের পাশাপাশি ২১৫ জনকে চারাগাছ বিতরণ করা হয়। শ্রাদ্ধবাসরকে এরকম বিশেষভাবে পালন করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে ডাঃ দাস বলেন, রক্ত দান হলো জীবন দান। দীর্ঘদিন ডাক্তারি পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য রক্তের প্রয়োজনীয়তা যে কতটা তা অনুধাবন করতে পেরেছি। তাই মায়ের পারলৌকিক ক্রিয়াকর্মকে কেন্দ্র করে যদি মানুষের উপকারে লাগতে পারি সেই উদ্দেশ্য নিয়েই এই ভাবনা। ডাঃ দাস প্রতি বছরই মায়ের শ্রাদ্ধে রক্তদান-সহ বিভিন্ন সেবাকাজের আয়োজন করবেন বলে জানিয়েছেন। উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের মধ্যবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক শ্রীকৃষ্ণ মণ্ডল, প্রান্ত ব্যবস্থা প্রমুখ প্রিয়ব্রত সরকার, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সেবা প্রমুখ ধনঞ্জয় ঘোষ এবং ক্রীড়া ভারতীর অখিল ভারতীয় সহ সম্পাদক মধুময় নাথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন তারকেশ্বর জেলা এবং ধনেখালি খণ্ডের বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক।

মেদিনীপুরের রানি লক্ষ্মীবাই

ড. অনিল কুমার ঘোষ

সময়টা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটল, ১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করল। মুঘল বাদশা দ্বিতীয় শাহ আলম নিজের শাসন ক্ষমতা ধরে রাখতে গিয়ে বাধ্য হয়েছিল কোম্পানিকে এই ক্ষমতা প্রদান করতে। কালবিলম্ব না করে কোম্পানি ১৭৬৭ সালে জঙ্গলমহল এলাকায় রাজস্ব সংস্কার করে কৃষকদের উপরে উচ্চহারে ভূমি রাজস্ব আরোপ করল। গর্জে উঠেছিল ১০০ ক্রোশব্যাপী সারা জঙ্গলমহল ইংরেজদের এই অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে। ভূমিজ, লোধা, মাঝি, শবর, কুর্মী, মুন্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি এই অঞ্চলের আদিম অধিবাসী। ইংরেজরা বিদ্রূপ করে এই মানুষগুলিকে 'চুয়াড়' নামে অভিহিত করেছিল। ইতিহাস তাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে এদের বিদ্রোহকে চুয়াড় বিদ্রোহ বলে। অনেকে এই বিদ্রোহকে প্রথম কৃষক বিদ্রোহ বলেন। কেউ এটিকে বলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন।

বাদশাহি আমলের মেদিনীপুর চাকলার অন্তর্গত অনেকগুলি ছোটো-বড়ো জমিদারির মধ্যে মেদিনীপুর শহর থেকে ৩/৪ কি. মি. উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত কর্ণগড় জমিদারি ছিল অন্যতম। স্বাধীনভাবে তারা তাদের জমিদারি চালাত বলে তাদেরকে রাজা এবং জমিদারি এলাকাকে রাজ্য বলা হতো। জমিদারেরা তখন তাদের রাজ্য, রাজধানী সুরক্ষা দেবার জন্য এই অধিবাসীদের মধ্য থেকে বলশালীদের নিযুক্ত করতেন, বিনিময়ে তাদেরকে নিষ্কর জমি চাষের অধিকার দেওয়া হতো। এদের বলা হতো পাইকান। দেওয়ানি লাভ করার পর কোম্পানি নিষ্কর জমির প্রথা বাতিল করল এবং তাদের জমির উপর উচ্চহারে ভূমিরাজস্ব আরোপ করল। উচ্চহারে ভূমি

রাজস্ব দিতে না পারায় অনেক ছোটো জমিদার তাদের জমিদারি হারাল, আর পাইকানরা হারাল তাদের নিষ্কর জমি চাষের অধিকার। প্রতিবাদে তারা মিলিতভাবে গড়ে তুলল এক জীবনপণ লড়াই। এদের এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কর্ণগড়ের রানি শিরোমণি। রানি শিরোমণির দেশভক্তি বিদেশি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে একরাশ ঘৃণা উগরে দিয়েছিল, চুয়াড় বিদ্রোহে নেতৃত্ব দানের মধ্য দিয়ে। শিরোমণির জন্মের প্রায় ১০০ বছর পরে ১৮২৮ সালে ঝাঁসির রানির জন্ম। স্থানীয় এলাকায় শিরোমণিকে তার বীরাঙ্গনার জন্য মেদিনীপুরের রানি লক্ষ্মীবাঈ নামে অভিহিত করে থাকে। তিনিই ছিলেন দেশের জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রথম মহিলা বন্দিনী।

কর্ণগড় দুর্গের পরিচিতি মহাভারতের সময় থেকে। প্রবাদ আছে, কর্ণগড়, দাতা কর্ণের গড় ও ভোজরাজের রাজধানী ছিল। এমন কথাও শোনা যায় যে সতীর দেহত্যাগের সময় এখানে সতীর কর্ণ পড়েছিল। তবে এসবই লোককথা বা জনশ্রুতি। রজনীকান্ত চক্রবর্তীর লেখা 'গৌড়ের ইতিহাস' সূত্রে জানা যায়, কর্ণগড় রাজবংশের অস্তিত্ব চতুর্দশ শতকের প্রথম দিকেও ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদ মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনে এসে মন্দির দর্শন করে, মন্দিরটি উৎকল প্রদেশের শিল্পরীতির বলে মত ব্যক্ত করেন। তবে যতটুকু জানা যায়, তা হলো উৎকলের কেশরীবংশের রাজা ইন্দ্রকেতু ও চন্দ্রকেতু দুই ভাই যথাক্রমে কর্ণগড় ও চন্দ্রকোণা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইন্দ্রকেতুর ছেলে নরেন্দ্রকেতু রণবীর নামে এক লোধা সর্দারের হাতে কর্ণগড়ের দায়িত্ব দিয়ে নবনির্মিত মনোহরগড়ে বাস করতেন। যোগেশচন্দ্র বসুর 'মেদিনীপুরের ইতিহাস' থেকে জানা যায়, গড়টির তিনপাশে জঙ্গল এবং পূর্বদিকে আবাস ও কৃষিযোগ্য ভূমি দেখতে পাওয়া যায়। জঙ্গলখণ্ড থেকে প্রবাহিত জলস্রোত নদীর আকার ধারণ করেছে যার নাম পারাং নদী যা কর্ণগড় দুর্গকে পরিখার মতো বেষ্টন করে আছে। এক ক্রোশ এলাকা জুড়ে রাজধানী, যেখানে রাজবাটী, সৈন্যশালা, দেবদেবীর মন্দির, দীর্ঘিকা, অন্দরমহল, বাহির মহল ছিল। অন্দরমহল ছেড়ে রাজ্যসভায় বসে সভাসদদের সঙ্গে আলোচনা পরামর্শ করে রানি রাজ্য চালাতেন। তাঁর প্রধান অমাত্য ছিলেন চুনিলাল খান, সভাকবি ছিলেন রামেশ্বর ভট্টাচার্য, যাঁকে যশোবন্ত সিংহ খড়ার যদুপুর গ্রাম থেকে আনিয়েছিলেন। কর্ণগড়ের আজ সবই প্রায় ধ্বংসস্তূপ। পারাং নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে, বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাচ্ছে কর্ণগড়।

রাজা যশোবন্ত সিংহের সময়ে কর্ণগড়ে রাজস্ব আদায় হতো ৪২ হাজার ২৬ টাকা ১২ আনা। মনে রাখতে হবে, সময়টা আজ থেকে ৪০০ বছরেরও আগের। সে সময় কর্ণগড়ের সেনা সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার। সৈন্যরা রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকত। একজোট করার প্রয়োজন হলে তোরণ দ্বার থেকে কাড়ানাকড়া বাজানো হতো। এখানে

কুলদেবী মহামায়ার মন্দিরে বসে রামেশ্বর ভট্টাচার্য রচনা করেছেন ‘শিবায়ন কাব্য’। পাশেই রয়েছে দণ্ডেশ্বর শিবের মন্দির। ১৭৪৯ সালে যশোবন্তের মৃত্যুর পর তার পুত্র অজিত সিংহ রাজ্য হন। কর্ণগড় রাজ্যের তিনিই শেষ রাজা। এই সময়ে কর্ণগড় রাজ্য দুর্ভাগ্যের শিকার হয়।

কর্ণগড়ের রাজা অজিত সিংহের দুই রানি —ভবানী ও শিরোমণি। রানি ভবানী নিঃসন্তান থাকায়, রাজা অজিত সিংহ শিরোমণিকে বিবাহ করেন। অল্পকাল মধ্যেই অজিত সিংহ ও রানি ভবানী মারা যান। ১৭৫৬ সাল থেকে নিঃসন্তান অজিত সিংহের রাজ্য কর্ণগড় শাসন করতে থাকেন রানি শিরোমণি। রানি শিরোমণি একদিকে যেমন ছিলেন সাহসী ও বুদ্ধিমতী, অন্যদিকে তেমনই স্থিতধী ও রূপবতী। রানির তখন তিনটি গড়— কর্ণগড়, আবাসগড় ও জামদারগড়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় কর্ণগড় রাজপ্রাসাদের রাজপরিবারের কুলদেবী মা মহামায়ার মন্দিরে সব লেঠেল জড়ো হতে থাকে, রানি তাদের কোম্পানির বিরুদ্ধে গেরিলা পদ্ধতিতে লড়াই করার কৌশল পরামর্শ দিতে থাকেন। এভাবে লড়াইয়ে সুবিধা ছিল যে জঙ্গলের অলিগলি বিদ্রোহীদের নখদর্পণে ছিল। ইংরেজদের গোলা বারুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের হাতে থাকত তির-ধনুক, বর্শা, লাঠি, সড়কি, টাঙ্গি, বল্লাম এবং গুলতি, বাটুল প্রভৃতি। এভাবেই ধীরে ধীরে একদিন রানি তাদের নেত্রী হয়ে ওঠেন। বিদ্রোহীরা রানির কথাকে মহামায়ার নির্দেশ বলে মনে করতো।

কোম্পানির রাজস্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলমহলে বিদ্রোহ শুরু হয়ে গেল। চুয়াড় বিদ্রোহ ১৭৬৯ সাল থেকে শুরু করে কয়েক দফায় ১৮৩২ সাল পর্যন্ত চলেছিল। ১৭৬৯ সালে ধলভূমের জমিদার জগন্নাথ সিংহের নেতৃত্বে ১৭৭১ সাল পর্যন্ত বিদ্রোহ চলেছিল। ১৭৮২ থেকে ১৭৮৪ পর্যন্ত বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল, জগন্নাথ সিংহের নাতি রঘুনাথ সিংহ। এছাড়াও অনেক ছোটো-বড়ো জমিদার এই লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিল, তারা সকলেই প্রায় ইংরেজদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে বর্ধিত রাজস্ব দিতে সম্মত হয়েছিল, যেমন— রামগড়, লালগড়, জামবনী, শিলদা, কল্যাণপুর, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি রাজ্যের জমিদারেরা কোম্পানির ব্যর্থতা স্বীকার করে নেয়। ব্যতিক্রম কর্ণগড়ের রানি শিরোমণি। তাই শিরোমণি ইংরেজদের কাছে হয়ে উঠেছিল একমাত্র মাথাব্যথার কারণ।

১৭৬৭ সালে কোম্পানির নতুন রাজস্ব নীতির প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন রানি। স্থানীয় লেঠেলদের ও বিদ্রোহের নেতাদের নিয়ে গোপন বৈঠক করেছেন, বিদ্রোহের কৌশল নিয়ে পরামর্শ দিয়েছেন কর্ণগড় ও আবাসগড়ে। শিরোমণির আত্মীয় ছিলেন নাড়াজোলের রাজপরিবার। ২১টি মহালের রাজস্ব আসত কর্ণগড়ে। ১৭৯৩ সালে বড়লাট কর্ণওয়ালিশ পাঁচশালা বন্দোবস্তের পরিবর্তে প্রবর্তন করলেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, আরও জোরদার হলো ইংরেজদের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা। বিপ্লবের জন্য খরচ করতে করতে কোম্পানিকে দেয় খাজনা কখন বাকি পড়ে গেছে, রানির সেদিকে খেয়ালই ছিল না। এই অজুহাতে ইংরেজরা শিরোমণির রাজ্য ও রাজধানী বাজেয়াপ্ত করল। এসময় রানির দেওয়ানকে রাজ্যের লোভ দেখিয়ে ইংরেজরা হাত করল। এই দেওয়ানকে রানি তার সভা থেকে আগেই এক অপরাধে বিতাড়িত করেছিলেন। পরবর্তীকালে তারই বিশ্বাসঘাতকতায় রানি ইংরেজদের হাতে ধরা পড়েন। আত্মীয় নাড়াজোলরাজ খানেদের সহায়তায় গড় পুনরুদ্ধার হলো। এসময় রানির নেতৃত্বে বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করেছিল।

১৭৯৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বিদ্রোহীরা প্রচার করে যে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রজনীতে বিদ্রোহীরা মেদিনীপুর শহর আক্রমণ করবে। কালেক্টর আশঙ্কা করে যে বিদ্রোহীরা নিশ্চয় তোষাখানা লুঠ করবে। এই আশঙ্কায় ১৬ মার্চ কালেক্টর সাহেব কর্নেল ডনকে লেখেন যে বিদ্রোহীরা তোষাখানা আক্রমণ করতে পারে, তাই ১৭ মার্চ কর্তৃপক্ষকে পত্রে তোষাখানার টাকা বুরুজখানায় রাখিতে ইচ্ছা করেন। এরপর ২১ মার্চের চিঠিতে মেদিনীপুর শহরে অগ্নি সংযোগের আশঙ্কা করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করেন। উপর্যুপরি ঘটনাবলী প্রমাণ করে শিরোমণির নেতৃত্বে বিদ্রোহ ইংরেজদের মধ্যে এক ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছিল। ১৭৯৯ সালের মার্চ মাসে শিরোমণি ৩০০ জন বিদ্রোহী নিয়ে মেদিনীপুরে কোম্পানির অস্ত্রভাণ্ডারের দখল নেন। এরপরে আর কর্তৃপক্ষ দেরি করেনি আবাসগড় ও কর্ণগড় আক্রমণ করে আবাসগড় থেকে প্রধান অমাত্য চুনিলালকে ও রানী শিরোমণিকে গ্রেফতার করতে, তারপর ৬ এপ্রিল শিরোমণিকে আবাসগড়ে নিয়ে আসা হয়। শিরোমণির ১৭৯৮-৯৯ সালে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দিয়েছিল– দুর্জন সিং, লাল সিং, মোহন সিং। কোম্পানি কঠোর হাতে এই বিদ্রোহ মোকাবিলা করেছিল। বেশ কিছু নেতাকে মেরে তাদের প্রকাশ্যে গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। ইংরেজ বণিকেরা ছিল অর্থলোভী, বেনিয়া জাতির, কিন্তু উদ্দেশ্য সাধনে নৃশংস প্রকৃতির।

বিদ্রোহ কয়েক দফায় সংঘটিত হলেও রানির নেতৃত্ব দানকালে বিদ্রোহ যেমন চরম আকার ধারণ করেছিল তেমনই ইংরেজরা যথেষ্ট ভয় পেয়ে গিয়েছিল। রাজা অজিত সিংহের মৃত্যুর পর নিঃসন্তান শিরোমণি ব্যক্তিজীবনের দুঃখ কষ্টকে সরিয়ে রেখে শক্ত হাতে কর্ণগড়ের শাসনভার তুলে নিয়েছিলেন নিজের কাঁধে। স্বামী নেই, সন্তানও নেই, আছে শুধু দেওয়ানের মতো বিশ্বাসঘাতক, লোভাতুর ইংরেজদের রক্তচক্ষু, আর আছে তার মুখাপেক্ষী রাজ্যের অগণিত দরিদ্র প্রজা।

প্রজাদের তিনি মাতৃস্নেহে আগলে রেখেছেন সারাটি জীবন। তাঁর প্রধান অমাত্য চুনিলাল আবাসগড়ে ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ার পরেই সুড়ঙ্গপথে আবাসগড় যাবার সময়ে রানি ইংরেজদের হাতে বন্দি হন। কলকাতায় বিচার শেষে তাঁকে আবাসগড়ে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। বন্দি করার পর তাঁকে কিছু সময় হিজলি জেলে ছোট্ট কুঠুরির মধ্যে রাখা হয়। এখন তা খড়্গপুর আইআইটি-র মধ্যে অবস্থিত। গৃহবন্দি থাকার সময়ে ১৮১২ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এমন একজন দেশপ্রেমী লড়াকু নেত্রীর স্মরণে স্থানীয় একটি পঞ্চায়েতের নাম রানির নামে এবং শিরোমণি ফাস্ট প্যাসেঞ্জার ট্রেন ছাড়া তেমন কোন উল্লেখযোগ্য শ্রদ্ধার্ঘ্য রাজ্য ও জাতীয় স্তরে গ্রহণ করা হয়নি, এটা স্থানীয় অধিবাসীদের ক্ষোভের কারণ। ◻

বঙ্গবিপ্লবের ‘সবুজ সার’ ভগিনী নিবেদিতা

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ও ড. মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতে গুপ্ত বিপ্লবের জনক ও জননী কে? হয়তো অনুসন্ধান বাকিই আছে বা থাকবে, কারণ বিপ্লবের শতকথা জানান দিয়ে হয় না, পাথুরে বা কাগুজে প্রমাণ লিখে রাখা যায় না। তবে ভগিনী নিবেদিতা, যিনি ভারতবাসীর কাছে ‘The gift unopened’, তিনি বিপ্লববাদেরও ‘উন্মোচন না হওয়া উপহার’, যা এখনও সবটা খুলে দেখিনি আমরা। ভারতবাসী তাঁকে এক বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকার বেশি ভাবতে পারেননি। হিমশৈলের চূড়ার মতো খানিকটা দেখা হয়েছে মাত্র; না জানার পরিধি বহুগুণ। হিমশৈল যতটা জলের উপর ভেসে থাকে তা মাত্র ১/৯ অংশ, জলের তলায় আরও ৮/৯ অংশ রয়ে যায় অলক্ষ্যে। তিনি প্রচার করে ভারতবর্ষকে ভালোবাসেননি! অন্তরাত্মার ডাকে এসেছিলেন, গুরুদেব স্বামী বিবেকানন্দের নির্দেশে তাঁর ভারত-যাপন শুরু হয়েছিলে। ভারতবর্ষের দুঃখ দারিদ্রকে উপেক্ষা করে, দেশের গ্রীষ্মপ্রধান জলবায়ুকে সহ্য করে, ইউরোপের সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে হেলায় দূরে সরিয়ে রেখে ভারতবাসীর সেবা করলেন। তাঁর ইহকাল-পরকাল ভারত সম্পৃক্ত হয়ে রইল।

নিবেদিতা দেশভক্তির সমার্থক। জৈবকৃষিতে ‘সবুজ সার’ বা Green Manure কথাটা আমরা শুনেছি। নিবেদিতার জীবনবোধটি সবুজ সারের এক খাঁটি উদাহরণ। তাঁর সম্পর্কে কবি মোহিতলাল মজুমদার বলেছিলেন, বঙ্গের নবজাগরণের মাটিতে হলকর্ষণের পর বীজবপন হলো, বৃষ্টিপাতও হলো। দিকে দিকে নতুন অঙ্কুর দেখা দিল। তারই মধ্যে একটি বীজ সকলের থেকে দূরে এক কোণে অঙ্কুরিত হলো। নিজেকে ফুলে ফলে বিকশিত করবার জন্য নয়। অন্য ফসলের সার হিসেবে ব্যবহার হবার জন্য। এই ফসল বাজার পর্যন্ত পৌঁছায় না। কেবল সার হবার ফসল।

১৮৯৮ সালের ২৮ জানুয়ারি ইংল্যান্ড থেকে ভারতবর্ষে এলেন নিবেদিতা। তিনি ভারতবর্ষকে মুক্তির পথ দেখানোর জন্য যে বিস্তৃত ক্ষেত্র খুঁজে পেলেন, তা স্বরাজ ভাবনার সর্বোত্তম দর্শন। কেবল রাজনৈতিক স্বাধীনতা নয়, ভারতকে ভেতর থেকে জাগাতে হলে, অন্তরাত্মায় যে উৎকৃষ্ট সম্পদ অবহেলায় রয়েছে তার জাগরণে উদ্যোগী হলেন। সমস্ত ক্ষেত্রেই তিনি সমন্বয় করলেন মাণিক্য ভাণ্ডার। নিবেদিতার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল এমন স্বাধীনতা সংগ্রামী, দেশপ্রেমী ও বিপ্লবীদের মধ্যে অরবিন্দ ঘোষ ছাড়াও ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপত রায়, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র ঘোষ, বাঘা যতীন, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র কানুনগো, গোপালকৃষ্ণ গোখেল, কাকুজো ওকাকুরা, সরলা ঘোষাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, প্রমথনাথ মিত্র, অতুলচন্দ্র গুহ (পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনের ভরত মহারাজ), গিরীন্দ্রনাথ মুখার্জী, দেবব্রত বসু, ভুপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ। তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপোশহীন সংগ্রামী। তিনি বিপ্লবীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন, বই দিয়েছেন, গোপন তথ্যও দিয়েছেন। দিয়েছেন বিপ্লবী কাজের অনুমোদন। সকল তথ্য হয়তো এখনও আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি।

বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষের সূত্রে জানা যায় তিনি চরমপন্থী বিপ্লবীদের কাছে ছিলেন ‘জোয়ান অব আর্ক’। স্বামীজীর শরীর গেছে ১৯০২ সালের ৪ জুলাই। তারপর নিবেদিতা তাঁর গুরুদেবের বাণী ও শিক্ষা দেশব্যাপী প্রচার করে বেড়িয়েছেন এবং পাশাপাশি ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সংস্রব ত্যাগ করেছেন। সম্পর্ক ত্যাগের বিষয়টি নিবেদিতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে দিয়ে বিপ্লবের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের ধারণাটি আরও গভীরে প্রোথিত করে দিয়েছিলেন। তরুণ বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ যে তাদের কেবল প্রেরণা দিয়েছিল তাই নয়, তাঁর নিজের বিপ্লবী সত্তাকে পরিস্কার করে দিয়েছিল।

নিবেদিতার সঙ্গে যোগাযোগ হলো জাপানি শিল্পী কাকুজো ওকাকুরার। সেই ওকাকুরা সম্পর্কে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন, ‘ওকাকুরা কেন, কী উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষে এলেন এবং আর সব জায়গা ছেড়ে এই রাজ্যের কলকাতা শহরেই-বা বাস করতে থাকলেন— এর গূঢ়ার্থ কিছু নিশ্চয়ই আছে। ...ওকাকুরার সঙ্গে নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্র বসু ও আমার দাদা গগনেন্দ্রনাথের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হলো। ওকাকুরার কথাবার্তা ও চিন্তাধারার দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কাছে ক্রমশ আসতে লাগল দলে দলে যুবকেরা। কয়েক মাসের মধ্যে এদের মনে এমন কিছু আদর্শের বীজ তিনি বুনে দিয়েছিলেন যা অঙ্কুরিত হয়ে পরে বাংলাদেশে বিপ্লব এনে দিল। বাঙ্গলার নবজাগরণ ঘটিয়ে তোলবার কাজে ওকাকুরা ও ভগিনী নিবেদিতার কাছে আমরা কতখানি যে ঋণী তা অনুমান করা কঠিন। কলকাতায় থাকতেই ভগিনী নিবেদিতার সাহায্যে ওকাকুরা লিখলেন Ideals of the East. মনে পড়ে তার প্রথম লাইন— ‘Asia is one. The Himalayas divide only to accentuate two mighty civilization...’ —পড়ে আমাদের গায়ে কী রকম কাঁটা দিয়ে উঠেছিল।’ অনুমান করা কঠিন নয়, জাপানে গুপ্ত বিপ্লবের প্রস্তুতি ভেতরে

ভেতরে চলছিল। পরে রাসবিহারী জাপানে গেলেন; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানি থেকে জাপানে পৌঁছালেন নেতাজী। প্রতিটি কাজের আগে তার বোধন সম্পন্ন হয়। নিবেদিতা ও ওকাকুরা সম্ভবত সেই বোধনের কাজটি শুরু করেছিলেন। স্বামীজী তাঁর জীবদ্দশায় সম্ভবত ওকাকুরার রাজনৈতিক প্রয়াস সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। এমন কথাও শোনা গেছে নিবেদিতা নাকি জগদীশ বসু ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ল্যাবরেটরি বিপ্লবের কাজে বিস্ফোরক তৈরির জন্য ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। গুজবগল্প কথা বলে কেউ কেউ এই ধরনের কিংবদন্তীকে ভিত্তিহীন বললেও, মানুষের দরবারে কিন্তু নিবেদিতা হয়ে উঠলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের এক নির্ভীক যোদ্ধা। তবে এটা ঠিক মারাত্মক বৈপ্লবিক নির্দেশ কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি চিঠিতে বা লেখাজোখায় রাখবেন না। এজন্যই গবেষক অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন, 'নানা পত্রে নিবেদিতা অনেকবার বলেছেন, চিঠিপত্রে সব কিছু খুলে বলা নিরাপদ নয়, তাই সে চেষ্টা করবেন না।'

শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে নিবেদিতার গোপন সহযোগিতা যে বৈপ্লবিক ক্ষেত্রে ছিল, তা নানান তথ্যসূত্রে পাওয়া যাচ্ছে। অরবিন্দের ভাই বারীন্দ্র লিখছেন, 'ভগিনী নিবেদিতা চরমপন্থী শ্রীঅরবিন্দের অগ্রগামী।' অরবিন্দের লেখাতেও নিবেদিতার বৈপ্লবিক সত্তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীঅরবিন্দের মতে, 'যখন বিপ্লব সম্বন্ধে কথা বলতেন, যেন তাঁর আত্মাই— তাঁর খাঁটি স্বরূপ বেরিয়ে আসত, তাঁর পুরো মন ও প্রাণ ভাষায় ব্যক্ত হতো।' এটাই হলো বিপ্লবের আগুনের ভাষা। সে সময় লোকসমাজে প্রচলিত ছিল, ১৯১০ সালে নিবেদিতা অরবিন্দের সম্ভাব্য গ্রেপ্তারের অগ্রিম খবর বিশ্বস্ত মাধ্যমে পাঠিয়ে শ্রীঅরবিন্দকে ব্রিটিশ শাসনের সীমার বাইরে ফরাসি চন্দননগরে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, এমনকী নৌকা ও মাঝির ব্যবস্থাও। এই সময় শ্রীঅরবিন্দ যে কলকাতায় নেই, অনুপস্থিতিতে নিজে তাঁর বরাদ্দ কাজ করে দিয়ে ব্রিটিশের চোখে ধুলো দিয়েছিলেন। জানা যায়, প্রথমে ফরাসি চন্দননগর ও পরে ফরাসি পণ্ডিচেরীতে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত কলকাতায় অবস্থান করে শ্রীঅরবিন্দের হয়ে 'কর্মযোগিন' পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনা করেছিলেন নিবেদিতা। ১৯১০ সালের ১ এপ্রিল শ্রীঅরবিন্দ চন্দননগর ছেড়ে যান এবং ৪ এপ্রিল পণ্ডিচেরী পৌঁছান। ২ এপ্রিল 'কর্মযোগিন' পত্রিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নিবেদিতা প্রায় ২০০টি জাতীয়তাবাদী ও বৈপ্লবিক গ্রন্থ অরবিন্দ পরিচালিত বাঙ্গলার প্রথম বিপ্লবকেন্দ্রে দান করেছিলেন যা পড়ে বিপ্লবীদের মধ্যে মুক্তিচিন্তা জাগ্রত হয়, উত্তাপ সংযুক্ত হয়। তার মধ্যে আইরিশ বিপ্লবের ইতিহাস ছিল, ছিল আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধের ইতিহাস, Economic History of British India, Un-British rule In British India ইত্যাদি।

নিবেদিতার ফরাসি জীবনীকার লিজেল রেমঁর কাছে অরবিন্দ- ভ্রাতা বারীন্দ্রের স্বহস্তে লিখিত ডকুমেন্ট রয়েছে। তাতে তিনি লিখছেন, '১৯০২ আগস্ট থেকে ১৯০৬ আগস্ট— এই পুরো চার বৎসর ভগিনী নিবেদিতা বাংলা ও ভারতে কাজ করেছেন— বক্তৃতা, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, রচনা এবং নানাবিধ কার্যাবলির দ্বারা তরুণদের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার করেছে। বৈপ্লবিক ভারতের যথার্থ নেতা শ্রীঅরবিন্দ চিত্রে আবির্ভূত হবার পূর্বে এই সকল ঘটেছে।' নিবেদিতা যে বিপ্লবীকাজে বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদিত 'নিউ ইন্ডিয়া' পত্রিকা এবং সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন সোসাইটি'-কে ব্যবহার করেছিলেন তাও তাঁর এই লেখা থেকে জানা যায়।

ব্রিটিশ শাসনে গুপ্ত বিপ্লবী সমিতিগুলির মূল শক্তি ও প্রেরণা ছিল বঙ্গপ্রদেশের কালীক্ষেত্রগুলি। বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন তত্ত্বের আদর্শে ব্যায়ামের আখড়ার আড়ালে বঙ্গপ্রদেশে স্থাপিত হলো সশস্ত্র ব্রিটিশ বিরোধী সংগঠন 'অনুশীলন সমিতি'। এই সংগঠনে যুক্ত ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ স্বয়ং। শাক্তদর্শনে বিশ্বাসী ছিল এই সংগঠন। ভগিনী নিবেদিতা, স্বামী সারদানন্দ, জাপানি ব্যক্তিত্ব কাকুজ ওকাকুরার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল সংগঠনের। শরীরচর্চা, লাঠিখেলা, তরোয়াল খেলা, ড্রিল, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি শিখতেন সদস্যরা। পাঠ নিতেন নৈতিকতা এবং জাতীয় আধ্যাত্মিকতার। স্বামীজীর দর্শন ও দেশপ্রেম তাদের নবচেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছিল। নিবেদিতার বাসাও ছিল গুপ্ত সমিতির এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

নিবেদিতা এই প্রেরণা পেলেন কোথা থেকে? স্বামীজী রচিত ঊনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিতা 'Kali the Mother' বা 'মৃত্যুরূপা মাতা' কবিতাটি থেকে। 'Who dares misery love,/And hug the form of Death,/ Dance in Destruction's dance,/To him the Mother comes.' (সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে, /কাল-নৃত্য করে উপভোগ,/মাতৃরূপা তারি কাছে আসে)। এ যে ভয়ংকরের পূজা, মৃত্যুর পূজা! এ যে কারুপুরুষের আত্মহত্যা নয়, এ যে শক্তিমানের মৃত্যু সম্ভাষণ! ভারতের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে তা এক আবশ্যিক পাঠ হয়ে দাঁড়াল। কাব্যের মোড়কে স্পষ্টই বার্তা দিলেন আগামী প্রজন্মের প্রতি। নিবেদিতা নিজেও লিখলেন গ্রন্থ, 'Kali the Mother'। ভয়ংকরী কালী যেন জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ নারীর ভয়ংকর বাসনা! যিনি ব্রহ্মময়ী, তিনিই দেশমাতৃকা, তিনিই ভারতমাতা। পুলিশের নজরও ছিল মঠ মিশন ও তার শাখাকেন্দ্রগুলিতে; ছিল জয়রামবাটিতে মায়ের ভিটেতে। মা সারদার ধারণা ছিল, নরেন বেঁচে থাকলে 'কোম্পানি' তাকে জেলে ভরে রাখত। অগ্নিযুগের বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ বলেছিলেন, অরবিন্দের রক্তে যে চির বিপ্লবের নেশা, তা স্বামীজীর স্পর্শে সঞ্জীবিত। স্বামীজী এই শক্তি আবার পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে। তাই বোমা-বিপ্লবীর আদানপ্রদান ও মত বিনিময়ের গুপ্ত ঠিকানা ছিল দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীতলার নির্জন স্থল। তারই পাশে আড়িয়াদহের বাচস্পতি পাড়ায় এক পুরোনো নির্জন বাড়িতে তৈরি হতো বোমাবারুদ; তা বিপ্লবীরা ছড়িয়ে দিতেন ভারতের নানাস্থানে। 'দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলা' ছিল তারই অনুষঙ্গজাত এক গুরুত্বপূর্ণ আইনি পদক্ষেপ।

অস্ট্রীয় নোবেলজয়ী পদার্থবিদ এর্ভিন শ্রুডিংগার একবার বলেছিলেন, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান Spiritual Anaemia-তে ভুগছে, তিনি প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে কিছু রক্তদান দেখতে চান। এই রক্তদান প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তার ফলেই 'পাশ্চাত্য রক্তে ওঙ্কার' ধ্বনিত হলো। বেরিয়ে এলেন 'সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর সর্বজয়ী তাপসী দুহিতা' ভগিনী নিবেদিতা। মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল থেকে গড়ে উঠলেন ভগিনী নিবেদিতা। ভারতবর্ষের মৃত্তিকার অণুতে, কৈশিক জলে তাঁর ভাবতনু ছড়িয়ে গেল, ছড়িয়ে গেল ভারতের বিপ্লববাদীদের কাছেও। □

শ্রীরাম বিরোধীরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে

আনন্দ মোহন দাস

গত ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ভব্য মন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচশো বছরের লড়াইয়ের অবসান ঘটল। রামমন্দির ভারতবাসীর কাছে ভারতীয় অস্মিতার প্রতীক এবং ভবিষ্যতের রাষ্ট্রমন্দির। এই দিনটি ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আপামর ভারতবাসীর স্বপ্ন পূরণ ও কয়েক লক্ষ মানুষের বলিদান সার্থক হলো। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিকতার বিজয় সুনিশ্চিত হলো। এই ঐতিহাসিক দিনে সর্বস্তরের মানুষ ও সাধু সন্তদের উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শ্রীরামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন। মন্দির পুনর্নির্মাণ আন্দোলনের নেপথ্যে থাকা মুখ্য সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক ডা. মোহনরাও ভাগবতও এই ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী থাকলেন। ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা হলো এবং কয়েক শতাব্দীর গ্লানি মুছে গিয়ে সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবোধের বিজয় ঘটল। নতুন ভারত গড়ার যাত্রাপথ মসৃণ হলো। শ্রীরামমন্দির পুনরুদ্ধার হলো অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের জয়, অসত্যের বিরুদ্ধে সত্যের জয়, অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের জয়। রামমন্দির পুনর্নির্মাণ হলো অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির বিজয়। এই ঐতিহাসিক দিনে বিদেশি লুণ্ঠনকারীর স্মৃতিচিহ্ন মুছে দিয়ে হিন্দু সমাজের উপর অপমানের কলঙ্ক ঘুচে গেল। তাইতো সমগ্র ভারতবাসী দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে উৎসবে মেতে উঠেছে। অকাল দীপাবলী উৎসব পালন করে জনগণ শ্রীরামচন্দ্রের বনবাসের পর অযোধ্যা প্রত্যাবর্তনের দিনটিকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। কেবলমাত্র ভারতবর্ষ নয়, বিশ্বের বহু দেশেই এই ঐতিহাসিক দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে বিভিন্ন অনুষ্ঠান জাঁকজমক সহকারে পালন করা হয়েছে। কারণ শ্রীরামচন্দ্র শুধু ভারতের নয়, সারা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের আরাধ্যপুরুষ। শ্রীরামচন্দ্র হলেন ভারতের আদর্শ ও সংস্কৃতির মূর্ত প্রতীক। ভারতের ঐতিহ্য ও পরম্পরার প্রতীক। শৌর্য ও বীর্যের প্রতীক। তাই রামরাজ্য প্রতিষ্ঠায় শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শ আজকের দিনে আরও বেশি প্রয়োজন তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। শ্রীরামচন্দ্র এমন একজন ব্যক্তিত্ব যাঁর নামে সমগ্র হিন্দু সমাজ ভাবাপ্লুত হয়। তিনি এমন এক আদর্শ পুরুষ যার নামে মানুষ উদ্বেলিত হয়, জাগ্রত হয় ও আন্দোলিত হয়। অযোধ্যায় জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে মানুষ মাতোয়ারা এবং উদ্বোধনের পরদিনই দেখা গেল রামলালা দর্শনের জন্য জনস্রোতে ভেসে উঠলো শ্রীরামমন্দির। এর আগেও প্রমাণ পাওয়া গেছে রামজন্মভূমি মুক্তি আন্দোলনে, শ্রীরামশিলা পূজনে ও করসেবায় ভারত জুড়ে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। আজকের এই ঐতিহাসিক দিনটি আপামর ভারতবাসীর কাছে খুশির দিন, আনন্দের দিন এবং গর্বের দিন। তাই স্বাভাবিকভাবেই সমাজের সর্বস্তরের মানুষের উপস্থিতিতে উদ্‌যাপিত এই দিনটি তা সকলের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বলাই বাহুল্য। শ্রীরামচন্দ্র ভারতের অন্তরাত্মা ও শ্রদ্ধার প্রতীক। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "দেশে শ্রীরামচন্দ্র ও মহাবীরের পূজা চালিয়ে দে দিকি। দেশটাকে এখন তুলতে হলে মহাবীরের পূজা চালাতে হবে, শক্তি পূজা চালাতে হবে, শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ঘরে ঘরে করতে হবে। তবে তোদের এবং দেশের কল্যাণ নতুবা উপায় নেই" (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা নবম খণ্ড, স্বামী–শিষ্য সংবাদ)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "রামকে পেলুম, সে তো একটি মাত্র মানুষের রূপে নয়। অনেক কাল থেকে, অনেক মানুষের মধ্যে যে সকল বিশেষ গুণের ক্ষণে ক্ষণে কিছু কিছু স্বাদ পাওয়া গেছে কবির মনে; সে সমস্ত দানা বেঁধে উঠল রামচন্দ্রের মূর্তিতে। রামচন্দ্র হয়ে উঠলেন আমাদের মনের মানুষ" —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (সাহিত্যের পথে)।

"বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণ কথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপরে যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে না, তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর"-- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (লোকসাহিত্য)।

"রামের জীবনের সকল কার্যেই উদার বীর্যবান সহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায়। একথা ভারতবর্ষ ভুলিতে পারে নাই যে তিনি চণ্ডালের মিতা, বানরের দেবতা ও বিভীষণের বন্ধু ছিলেন। তিনি শত্রুকে ক্ষয় করিয়াছিলেন, এ তাহার গৌরব নহে। তিনি শত্রুকে আপন করিয়াছিলেন। তিনি আচারের নিষেধকে, সামাজিক বিদ্বেষের বাধাকে অতিক্রম করিয়াছিলেন। তিনি আর্য-অনার্যের মধ্যে প্রীতির সেতু বন্ধন করিয়া দিয়াছিলেন"---রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা)।

দেশবরেণ্য মনীষীদের দ্বারা শ্রীরামচন্দ্রের মূল্যায়নকে যারা অগ্রাহ্য করেন, তারাই রামমন্দির উদ্‌ঘাটনের বিরোধিতা করেছেন। ওই সমস্ত

ফঃ ৫

রামবিরোধী ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দলগুলিকে ভারতের মানুষ কোনদিনই ক্ষমা করবেন না।

তাই অযোধ্যায় শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির সসম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা যাদের সহ্য হয়নি তারাই রামমন্দির পুনর্নির্মাণের বিরোধিতা করেছেন। এরা প্রকৃতপক্ষে দেশের সভ্যতা ও সনাতন সংস্কৃতির বিরোধী। এরা দেশের গৌরবময় ইতিহাস, ঐতিহ্য, পরম্পরা ও হিন্দুত্বের বিরোধী। এরা সমাজে বিভিন্ন মিথ্যা ন্যারেটিভ চালু করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে থাকে। কখনো রাম কাল্পনিক চরিত্র বলে অস্বীকার করে। এরা রামকে বাঙ্গালির নয়, উত্তর ভারতের বলে সংকীর্ণ মানসিকতার পরিচয় দিয়ে সত্যকে অস্বীকার করেন। অথচ সেই দুর্গাপূজাই বাঙ্গালিরা করে থাকেন যা শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কা বিজয়ের আগে শরৎকালে অকালবোধনে করেছিলেন। রামনামের মাধ্যমেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বঙ্গপ্রদেশে ভক্তি- আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এই রাজ্যে বহু স্থানে রামমন্দির রয়েছে যেখানে নিত্যদিন রামের পূজা হয়। এই রাজ্যে বহুসংখ্যক স্থানের নাম এবং ব্যক্তির নামও রামের নামে রাখার প্রচলন রয়েছে। এরকম বহু উদাহরণ আমাদের সামনে রয়েছে, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বাঙ্গালির কাছে রামের গ্রহণযোগ্যতা কোন অংশে কম নয়। প্রকৃতপক্ষে শ্রীরামকে কোনো সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখা যায় না। তিনি যেমন সারা ভারতের, আবার সারা বিশ্বেরও। তাই আন্তর্জাতিক স্তরে অযোধ্যার শ্রীরামচন্দ্রের ভব্যমন্দির সমাদৃত হয়েছে।

যদিও মিথ্যার বেসাতি করা কমিউনিস্টদের চরিত্রের মধ্যে রয়েছে। এরাই স্বামী বিবেকানন্দকে 'বিবিকা আনন্দ' নামে কটাক্ষ করেছে। বেকারত্বের জন্য সাধু হয়েছেন বলে স্বামীজীকে উপহাস করেছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে মৃগীরোগীর সঙ্গে তুলনা করে তাঁর সাধনাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছে। এরা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে ব্রিটিশের দালাল বলে অপমান করেছে। নেতাজীকে জাপানের 'তেজোর কুকুর' নামে আখ্যায়িত করেছে। সুতরাং জাতীয়তাবিরোধী বিদেশি আদর্শে বিশ্বাসী কমিউনিস্টরা যে রামের নামে বিরোধিতা করবে এটাই স্বাভাবিক। তাই তারা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-সহ কয়েকটি জায়গায় শ্রীরামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেছে। তাদের কুকর্মের জন্য এরাজ্যে আজ তারা নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। দলের এমএলএ, এমপির সংখ্যা শূন্যে পরিণত হয়েছে এবং প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। সারা বিশ্বে তাদের মতাদর্শ আজ বস্তাপচা হিসেবে পরিত্যজ্য হয়েছে। এই ধরনের দলগুলির অযোধ্যায় শ্রীরামের মন্দির পুনর্নির্মাণের বিরোধিতা মানুষ যে ভালোভাবে নেবেন না তা আগামী লোকসভা নির্বাচনে তারা বিলক্ষণ প্রমাণ পাবেন। এরাজ্যের বর্তমান শাসকদল এই ঐতিহাসিক দিনটিতে মুসলমান ভোটের লোভে সম্প্রীতি মিছিলের নামে ভারতীয় সমাজে শ্রীরামের অবদানকে লঘু করার চেষ্টা করেছে। এতে হিন্দু সমাজ অপমানিত বোধ করেছে। অভিযোগও পাওয়া গেছে তোষণের রাজনীতি করতে গিয়ে কোথাও কোথাও শাসকদলের কিছু নেতা ওই দিনটিতে স্থানীয়ভাবে শ্রীরামের পূজার বিরোধিতা করেছেন এবং পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতায় শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করতে বাধা দিয়েছেন। অথচ সারা ভারতে বিভিন্ন স্থানে মুসলিমরাও উৎসাহ সহকারে শ্রীরামের পূজায় অংশগ্রহণ করেছেন। এরাজ্যে কমিউনিস্টদের পথ অনুসরণ করে বর্তমান শাসকদলও একইভাবে হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এখানে রামনবমীর শোভাযাত্রায় বাধা দেওয়া হয়। রামমন্দির উদ্বোধনের বিশেষ দিনে বা রামনবমীতে ছুটি দেওয়া হয় না। অথচ মরিশাসের মতো দেশ ছুটি দিয়ে জনগণকে উৎসব পালন করার সুযোগ দেয়। যদিও দেশের বেশিরভাগ রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওইদিন অর্ধদিবস ছুটি ঘোষণা করেছিল। রাম-বিরোধীরা রামমন্দির পুনর্নির্মাণের বিরোধিতা করে হিন্দুদের ভাবাবেগে আঘাত দিলেন না কি? শাসকদলের নেত্রী সম্প্রীতি মিছিল অন্যদিন না করে অন্য বার্তা দিলেন না কি? এদের কাছে ভগবান রামের চেয়ে বাবর, ঔরঙ্গজেবের গুরুত্ব অনেক বেশি। যে দল আপাদমস্তক দুর্নীতি ও অনাচারের পাঁকে নিমজ্জিত তারা যে আদর্শবাদী শ্রীরামচন্দ্রের বিপক্ষে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। যদিও এই তুচ্ছ বিরোধিতাকে ম্লান করে দলের হুমকি ও নির্দেশ উপেক্ষা করে যেভাবে শাসকদলের নীচুতলার কর্মীরাও এগিয়ে এসে রামের পূজা করেছেন বা সাহায্য করেছেন তা প্রশংসনীয়। সংবাদে প্রকাশ, উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়ায় দলীয় নেতা শ্রীরামের মূর্তি স্থাপন করে পূজার্চনা করেছেন এবং পুরো এলাকায় অকাল দীপাবলী করেছেন। তিনি আবার দলীয় কাউন্সিলরের স্বামী যিনি প্রকাশ্যে বলেছেন দলের আগে নিজের ধর্ম। ভারতের প্রিমিয়ার ইনস্টিটিউট আইআইটি খড়্গপুরের ছাত্ররা রামনামে যেভাবে মেতে উঠেছিল তা এই রামবিরোধীদের মুখে বিরাশি সিক্কার থাপ্পড়। বিরোধী জোটের মুখিয়া কংগ্রেস দলেও শ্রীরামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠার দিনে উপস্থিত হওয়া নিয়ে দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মতভেদ প্রকট হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করে দলীয়ভাবে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। তার ফলে কেউ কেউ দলত্যাগ করেছেন। দলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গুজরাটের এক কংগ্রেস এমএলএ তার সদস্যপদ ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। ইতিহাস বলছে, গুজরাটের সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণেরও বিরোধিতা করে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরু অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত ছিলেন। সুতরাং কংগ্রেস দলের বিরোধিতা নতুন কিছু নয়। অন্যদিকে দলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হিমাচল প্রদেশ সরকারও কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ওইদিন ছুটি ঘোষণা করেছে। ইন্ডিয়া জোটের দলগুলি সংখ্যালঘুদের ভোটের লোভে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থেকে হিন্দু সমাজের ভাবাবেগে আঘাত দিয়ে নিজেদের কবর খুঁড়েছে। মেকি ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলি রাম বিরোধিতার নামে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরোধিতা করেছে।

এদেশের রামের যারা বিরোধিতা করবে, তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কারণ শ্রীরাম আপামর ভারতবাসীর হৃদয়ে রয়েছেন। এস ওয়াজেদ আলির ভাষায় ভারতবর্ষে 'সেই ট্র্যাডিশন (রামায়ণ পাঠ) সমানে চলেছে।' ভারতবর্ষ যতদিন থাকবে রামের পূজা, মা কালীর পূজা হবে এবং রামায়ণ, মহাভারত ও গীতা পাঠ চলবে। রামবিরোধী শক্তির বিনাশ হবেই এবং নবভারতের উদয় হবে।

ডায়মন্ডহারবার থেকে আন্দামান

‘রামমন্দির’ ডাকটিকিট সংগ্রহ করার জন্য সমগ্র ভারতবাসীর তীব্র আকুলতা

প্রদীপ মারিক

রামমন্দির নিয়ে উন্মাদনায় ভাসছে ভারতবর্ষ। প্রাণপ্রতিষ্ঠার আগের দিন ডাকটিকিট প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রামমন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগ আদিত্যনাথ। একইসঙ্গে সারা বিশ্বে ভগবান রামকে নিয়ে যত ডাকটিকিট রয়েছে, সেই সংবলিত একটি বইও প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই ডাকটিকিটের নকশায় রয়েছে রামমন্দির, চৌপাই মঙ্গল ভবন অমঙ্গল হরি, সূর্য, সরযূ নদী এবং মন্দিরের ভিতর ও বাইরের মূর্তি। রামমন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে মোট ৬টি ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়েছে। বিভিন্ন দেব-দেবীকে নিয়ে সেই ডাকটিকিট। রামমন্দির, ভগবান গণেশ, বীর হনুমান, জটায়ু, নিষাদরাজ এবং মা শবরীকে নিয়ে রয়েছে ডাকটিকিটগুলি। সূর্যের রশ্মি এবং চৌপাইয়ের সোনার পাতা ডাকটিকিটকে অন্যমাত্রা যোগ করেছে। পাঁচটি ভৌত উপাদান যেমন আকাশ, বায়ু, আগুন, পৃথিবী ও জল যা পঞ্চভূত নামে অভিহিত, বিভিন্ন নকশা উপাদানের মাধ্যমে তা প্রতিফলিত হয়েছে। ডাকটিকিটের মধ্যে পঞ্চভূতের নিখুঁত সামঞ্জস্য রয়েছে। ডাকটিকিট সংবলিত বইটি শ্রীরামের আন্তর্জাতিক স্তরে যে আবেদন, তা প্রদর্শনের একটি প্রয়াস। ৪৮ পৃষ্ঠার এই বইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নিউজিল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, কানাডা, কম্বোডিয়া এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের মতো সংস্থা-সহ ২০টারও বেশি দেশের ডাকটিকিট রয়েছে।

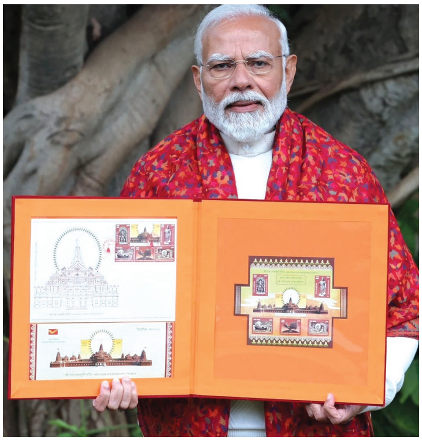

অযোধ্যার মন্দির চত্বরে রামকথাকুঞ্জ জুড়ে থাকবে এক বাঙ্গালি শিল্পীর শিল্পকলাও। রাজা দশরথের পুত্রাভিষেক যজ্ঞ থেকে রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত মোট ১০০টি খণ্ডে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের জীবনী তুলে ধরা হবে অযোধ্যার রামমন্দিরের সম্মুখে। প্রতিটি খণ্ডচিত্র তুলে ধরা হবে মূর্তির মাধ্যমে। জন্ম

অসমের কাছারে হলেও বর্তমানে নদীয়ার বাসিন্দা রঞ্জিত মণ্ডল অযোধ্যায় পড়ে রয়েছেন কয়েক বছর ধরে। থাকবেন আরও কয়েক বছর। রামায়ণের ১০০টি খণ্ডচিত্রের মধ্যে ৫৪টি তৈরি করে ফেলেছেন ইতিমধ্যেই। তৈরি করতে হবে তাঁকে আরও ৪৬টি খণ্ড। বেশ কয়েক বছর আগে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তৎকালীন আন্তর্জাতিক কার্যকরী সভাপতি অশোক সিঙ্ঘলের চোখে পড়ে যান রঞ্জিত। তাঁর ডাক পড়ে অযোধ্যায়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক কর্মকর্তা জানাচ্ছেন, রামমন্দিরের সামনে তৈরি হবে রামকথা কুঞ্জ। সেই কুঞ্জের মূল আকর্ষণ হবে রামায়ণের এই ১০০টি খণ্ড। ভারতীয় ডাকঘর ১৮৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এশিয়ার প্রথম আঠালো স্ট্যাম্প সিন্ডে ডক, ১৮৫২ সালে সিন্ধুপ্রদেশের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসক স্যার বার্টল ফ্রেয়ার দ্বারা প্রবর্তন করা হয়েছিল।

ভারতীয় ডাক ব্যবস্থা একটি বিস্তৃত, নির্ভরযোগ্য এবং শক্তিশালী নেটওয়ার্কে বিকশিত হয়েছে যা ভারতের প্রায় সমস্ত অংশ, বার্মা, স্ট্রেইট সেটেলমেন্ট এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অন্যান্য এলাকায় সংযোগ প্রদান করতে। সংস্কারক রোল্যান্ড হিল দ্বারা ইংল্যান্ডে প্রবর্তিত মডেল ডাক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে, কম খরচে দক্ষ ডাক পরিষেবা সরবরাহ করা হয়েছিল এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এর উত্তরসূরি, ব্রিটিশ রাজ্যের মসৃণ বাণিজ্যিক, সামরিক ও প্রশাসনিক কার্যকারিতা সক্ষম করে। ইম্পেরিয়াল পোস্টগুলি ভারতের বিভিন্ন রাজ্য দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা বেশ কয়েকটি ডাক ব্যবস্থার সঙ্গে সহ-অস্তিত্ব ছিল, যার মধ্যে কয়েকটি তাদের নিজ নিজ রাজ্যের মধ্যে ব্যবহারের জন্য স্ট্যাম্প তৈরি করেছিল, যখন ব্রিটিশ ভারতীয় ডাকটিকিটগুলি এই দেশের সীমানার বাইরে মেল পাঠানোর জন্য প্রয়োজন ছিল। টেলিগ্রাফি টেলিফোনি পৃথক বিভাগ হওয়ার আগে পোস্টের অংশ হিসেবে তাদের উপস্থিতি তৈরি করেছিল। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীতার পর, ভারতীয় ডাক পরিষেবা দেশব্যাপী কাজ করে চলেছে এবং ভারতের জনসাধারণকে অনেক মূল্যবান, কম খরচে পরিষেবা প্রদান করছে।

ডাকটিকিট দিয়ে বাড়ির বসার ঘর সাজাতে টাইমস অব লন্ডন পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন এক মহিলা। সেই শুরু ডাকটিকিট সংগ্রহের। জর্জ হারপিন ডাকটিকিট সংগ্রহের গ্রিক ভাষার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দিয়ে এর নাম দেন 'ফিলাটেলি'। রাজা পঞ্চম জর্জ থেকে রানি দ্বিতীয় এলিজাপেথ, মিশরের রাজা ফারুখ, মোনাকোর রাজকন্যা তৃতীয় রেনিয়র, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট, পিয়ানো প্রস্তুতকারক থিয়োডর ই স্টাইনওয়ে, চার্লি চ্যাপলিন থেকে জন লেনন যুগে যুগে অজস্র নামি ব্যক্তি জড়িয়ে গিয়েছেন ডাকটিকিট সংগ্রহের নেশায়।

বর্তমানে ডায়মন্ডহারবার পোস্টঅফিস থেকে আন্দামান পোস্ট অফিস অর্থাৎ সারা ভারতবর্ষের প্রত্যেক পোস্ট অফিস থেকে রামমন্দিরের পোস্টাল স্ট্যাম্প কেনার জন্য দেশবাসীর মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছে। 'জয় শ্রীরাম' এই ধ্বনিতেই জনজোয়ার এসেছিল ভারতীয় জনমানসে। ১৯৮৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে যে বিজেপির মাত্র দু'জন এমপি ছিল, সেখান থেকে মাত্র পাঁচ বছর পরেই গোটা দেশে তাদের আসনসংখ্যা বেড়ে হয় ৮৬। ২০১৪ সালের মধ্যেই তারা ২৮২টি আসনে জিতে একার শক্তিতে সরকার গড়ার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে। এই চমকপ্রদ রাজনৈতিক উত্থানের পেছনে রামমন্দির আন্দোলনের এবং সেই সঙ্গে দলের প্রবীণ নেতা লালকৃষ্ণ আদবানির নেতৃত্বে 'রথযাত্রা'র যে একটা বিরাট ভূমিকা আছে, রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা সবাই তা মানেন।

চল্লিশের দশকে গড়ে ওঠা রামমন্দির আন্দোলনে সেদিন যে দশজন সমস্বরে আওয়াজ তুলেছিলেন 'মন্দির ওহি বানায়েঙ্গে' তাদের সেই আওয়াজে গলা মিলিয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। গুজরাটের সোমনাথ মন্দির থেকে অযোধ্যায় রামজন্মভূমি পর্যন্ত বিশাল রথযাত্রার আয়োজন করেছিলেন লালকৃষ্ণ আদবাণী। প্রবল জনসমাগম-সহ এই রথযাত্রা বিহারে প্রবেশ করলে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদব তাকে আটক করেন। তবে এই রথযাত্রা কিন্তু হিন্দু জনমনে পাকাপাকি ভাবে স্থান করে নেয়। আদবানি তার আত্মজীবনী 'My Country My Life' এ এই অধ্যায়ের অনেক কথা বলেছেন।

তারপরই উঠে আসে মুরলী মনোহর যোশীর নাম। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর ছাত্র ফিজিক্সের অধ্যাপক মুরলী মনোহর যোশীকে এক সময় বলা হতো 'বিজেপির অধ্যাপক'। বলতে গেলে আজ যে ভাবে ভারতীয় জনতা পার্টি নিজেদের মেলে ধরেছে তার সিংহভাগ কৃতিত্ব রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের। ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর ঐতিহাসিক অযোধ্যা মামলার রায় দিলেন সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ। অনেক বাধা পেরিয়ে অযোধ্যা ট্রাস্টি বোর্ড এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রচেষ্টায় আজ অযোধ্যা নগরীতে রামমন্দিরে রামলালা প্রতিষ্ঠিত হলেন। সেই সঙ্গে নবনির্মিত রামমন্দির ডাকটিকিটের মাধ্যমে একশো চল্লিশ কোটি দেশবাসীর কাছে পৌঁছে যাবে। এটাই ভারতবর্ষ। রামমন্দির শুধু উন্মাদনা নয়, ভারতীয়ত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। □

কলকাতায় প্রথম অর্ধশত শ্রীরাম চিত্র প্রদর্শনী

তিলক সেনগুপ্ত

কলকাতা প্রত্যক্ষ করল অর্ধশত শ্রীরাম চিত্র, যা দেখে ভিড় করল শহরের শতাধিক জনতা। অযোধ্যা ধামে শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠার আগের দিন সন্ধ্যায় ২১ জানুয়ারি এক সুন্দর প্রদর্শনীর আয়োজন করে অখিল ভারতীয় সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠান সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ।

অযোধ্যা ধামে শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ভারতীয় জাদুঘরের আশুতোষ জন্মশতবর্ষ হলে ২১ জানুয়ারি বিকেলে আয়োজিত হলো 'নমামি রঘুবীরম' শীর্ষক অনুষ্ঠানের। ভারতীয় সংগ্রহশালা, কলকাতা, পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্র এবং মৌলনা আবুল কালাম আজাদ ইন্সটিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজক ছিল 'সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ'। কলকাতায় শতাব্দী প্রাচীন ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের হলে বাঙ্গালিরা এবার এক ছাদের নীচে শ্রীরামচন্দ্রের ৫০টি চিত্র দেখার সুযোগ পেল। শ্রীঅযোধ্যার শ্রীরামমন্দির উদ্বোধনের প্রাক্কালে কলকাতায় 'রাম চিত্রকথা' নামে এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন দিল্লির ন্যাশনাল গ্যালারি অব মর্ডান আর্টসের অধিকর্তা ড. সুনীল কিশোর গৌতম। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে শিল্পীদের আঁকা রামচন্দ্রের বিভিন্ন ছবি ডিজিটাইজের পর প্রিন্ট নিয়ে ১৮ ইঞ্চি প্রস্থ পিচবোর্ডের ওপর স্থাপন করা হয়েছে। সেগুলো লাগানো হবে ভারতীয় জাদুঘর সংলগ্ন আশুতোষ জন্মশতবর্ষ হলে। দেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ২৫ জন শিল্পীর পাঠানো শ্রীরামচন্দ্র বিষয়চিত্র এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে।

১৭ থেকে ৭০ বছর বয়সের এই শিল্পীদের মধ্যে আছেন পশ্চিমবঙ্গের তিনজন। সেদিন বিকেল সাড়ে চারটেয় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ন্যাশনাল গ্যালারি অব মডার্ন আর্টের ডিজি সঞ্জীব কিশোর গৌতম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন 'সংস্কার ভারতী'র সর্বভারতীয় সভাপতি তথা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী বাসুদেব কামাথ। দর্শকরা প্রদর্শনীতে শিল্পীদের দেখারও সুযোগ পেয়েছেন।

এছাড়াও ছিলেন বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনীল বিশ্বকর্মা, কাশ্মীরের অমরজিৎ সিংহ, উত্তরপ্রদেশের সুনীল খুসোয়া, লখনউয়ের জাতীয় পুরস্কার বিজয়ী সুনীল কুমার সিংহ, গুজরাটের ড. অশোক প্যাটেল, জাতীয় পুরস্কার বিজয়িনী নিরুপমা টাঙ্ক এবং দর্শনা ভাদুরিয়া প্রমুখ ৩০ জন। এই সব ছবির একটা কপি বুক সংকলন করার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও জান গেছে উদ্যোক্তাদের কাছে।

পশ্চিমবঙ্গের বুকে সারা দেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ২৫ জন শিল্পীর পাঠানো শ্রীরামচন্দ্র বিষয়চিত্র এই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছে। কলকাতার বুকে এই প্রথম শ্রীরামচন্দ্রকে নিয়ে এই প্রথম এত বড়ো প্রদর্শনীর আয়োজন হলো। □

উপহার

এক কিশোর তার মায়ের সঙ্গে একটি কুকুরের ছানা কেনার জন্য বাজারের একটি দোকানে গিয়েছে। সেখানে চারটি ছানা এক সঙ্গে বসে ছিল। ছানাগুলির প্রতিটিই খুব সুন্দর ছিল। কিশোরের মা দাম জিজ্ঞাসা করায় দোকানদার বলল, এক-একটির দাম পাঁচশো টাকা।

হঠাৎ কিশোরের নজর পড়ল দোকানের এক কোণে আর একটি ছানা চুপচাপ বসে আছে।

কিশোর জিজ্ঞাসা করল— এই ছানাটিও কি বিক্রির জন্য? ও একলা কেন বসে আছে?

দোকানদার বলল—- এগুলিরই একটা ওটা। কিন্তু ওটা অসুস্থ। তাই ওটা বিক্রি করার জন্য নয়।

কিশোর বলল— ওটার কী হয়েছে? দেখতে তো ভালোই মনে হচ্ছে।

দোকানদার বলল, না, ওটার একটা পা ভাঙা।

কিশোর আবার জিজ্ঞাসা করল, আপনি ওটাকে কী করবেন?

দোকানদার বলল, ওটাকে মেরে ফেলা হবে।

কিশোর ছানাটির দিকে করুণভাবে তাকিয়ে বলল, আমি কি ওই ছানাটিকে একটু দেখতে পারি? দোকানদার সম্মতি দিলে কিশোর ছানাটিকে কোলে তুলে নিতেই ছানাটি কিশোরের কান, গাল চাটতে লাগল। কিশোরটিও ছানাটির মাথায় হাত বুলাতে লাগল। একটু পরেই সে দোকানদারকে বলল, আমি এই ছানাটিই নেব। দোকানদার বলল, এটা বিক্রির জন্য নয়। ওটার তো একটি পা নেই।

কিশোরের মা-ও তার ছেলেকে ছানাটিকে না নেবার জন্য বলতে লাগল। কিন্তু কিশোরে জেদে দোকানদার বিক্রি করতে রাজি হলো। কিশোর তার পকেট থেকে কিছু টাকা আর কিছু মায়ের থেকে কিছু চেয়ে নিয়ে দোকানদারকে দিয়ে ছানাটিকে নিয়ে রওনা হতেই দোকারদার জিজ্ঞাসা করল, তুমি এই খোঁড়া ছানাটি কেন কিনলে?

কিশোর একটিও কথা না বলে ধীরে ধীরে তার বাঁ পা থেকে প্যান্টটি ওঠালো। দেখা গেল তার বাঁ পা-টি কৃত্রিম। এটা দেখার পর দোকানদার হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে বলল, আমি তোমার ব্যথা আর এই অবোলা প্রাণীটির মনঃকষ্ট বুঝতে পারলাম। তোমাকে এই ছানাটির জন্য টাকা দিতে হবে না,টাকাটা তুমি রাখো, আমি তোমাকে এটি উপহার হিসেবে দিলাম।

ছানাটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে কিশোর তার মায়ের সঙ্গে বাড়ির দিকে রওনা দিল।

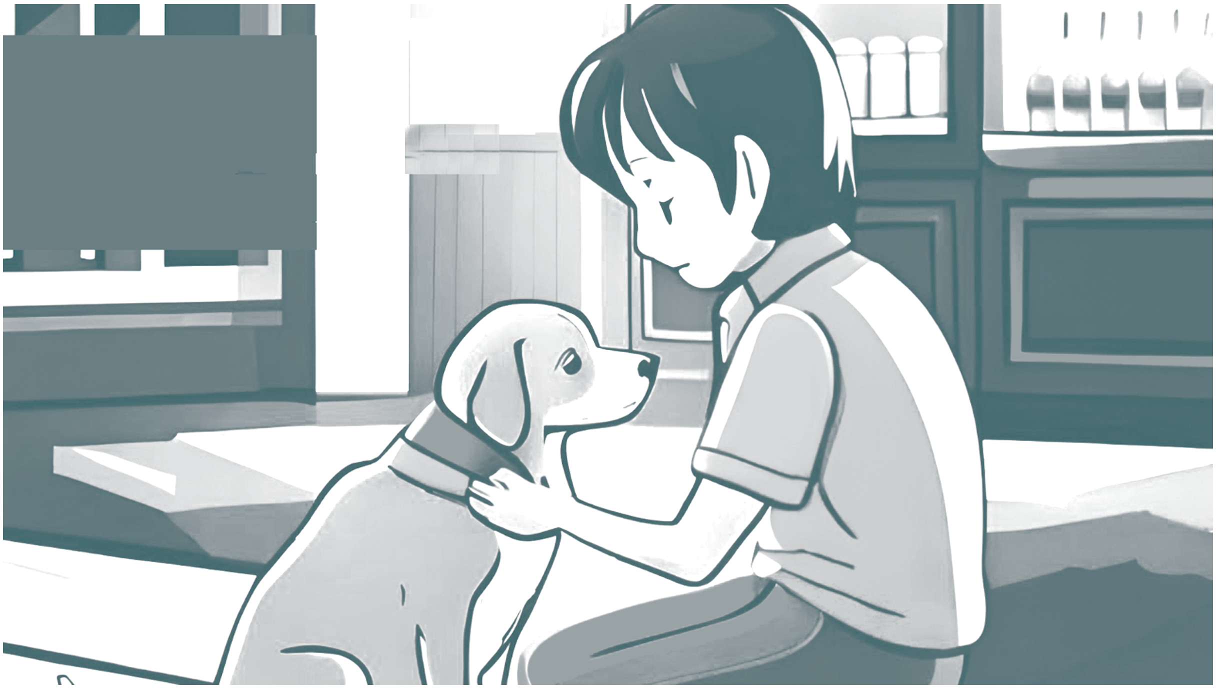

হিমাদ্রিশেখর

বীর বনবাসী

বীর গুনডাধুর

জনজাতি স্বাধীনতা সংগ্রামী বীর গুনডাধুর অধুনা ছত্তিসগড় রাজ্যের বস্তার জেলার নেতানার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নিজের সমাজ ও দেশের জন্য তিনি সর্বস্ব বলিদান দিয়েছিলেন। বস্তার এলাকার জমিদার ও দেশীয় রাজারা ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছিল। তারাও ইংরেজের হয়ে স্বাধীনচেতা জনজাতিরদের ওপর শোষণ ও অত্যাচার করছিল। বীর গুনডাধুর নিজ সম্প্রদায়ের মানুষদের স্বাভিমান জাগরণের জন্য ঘরে ঘরে লাল লঙ্কা, মাটির ধনুষ-বাণ আর আমগাছের ডাল পাঠানো শুরু করেছিলেন। ধীরে ধারে তা একটা আন্দোলনের রূপ ধারণ করে। তাঁর নেতৃত্বে জনজাতি যোদ্ধারা মরণপণ লড়াই শুরু করলে ব্রিটিশ সৈন্য এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তিনি জনজাতিদের মধ্যে এমন স্বাভিমান সৃষ্টি করেছিলেন যে পঁচিশ হাজার যোদ্ধা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রাণ বলিদান করে। একসময় ইংরেজদের হাতে বন্দি হলে তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

এসো সংস্কৃত শিখি-৯

অস্তি— নাস্তি (আছে— নেই)

কিং কিম্ অস্তি?— কী কী আছে?

কিং কিম্ নাস্তি?— কী কী নেই?

পিপাসা অস্তি — পিপাসা আছে।

জলম্ নাস্তি — জল নেই।

ফলম্ অস্তি। বীজং নাস্তি।

পুষ্পং অস্তি। গন্ধঃ নাস্তি।

মস্তকম্ অস্তি। বুদ্ধিং নাস্তি।

কর্কটরোগ অস্তি। ঔষধম্ নাস্তি।

ঈশ্বরঃ অস্তি। ভয়ং নাস্তি।

অভ্যাস করি—

ছাত্রঃ---শিক্ষকঃ, বুভুক্ষা---ভোজনম্, গৃহম্—গৃহিণী।

ভালো কথা

বোনের জন্মদিন

গত ৩রা মাঘ, ১৮ জানুয়ারি আমার বোন অগ্নিকার জন্মদিন ছিল। আমিই প্রথম ওকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছি। সেদিন স্কুল থেকে ফিরে প্রথমে ঘর সাজিয়েছি। সন্ধ্যায় শাখার দাদারা ও বন্ধুরা এক-এক করে এল। বাড়ির সবাই বোনকে নিয়ে ঘরে বসল। এবার বোনের প্রথম জন্মদিন। তাই একটি বড়ো প্রদীপ ঠাকুর্দা ও ঠাকুমা জ্বালালেন। সেই সময় দেবুদা দীপপ্রজ্বলন মন্ত্র বলছিল। তারপর গায়ত্রীমন্ত্র, মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্র, সংগঠন মন্ত্র ও শান্তিমন্ত্র সমবেতভাবে হলো। ঠাকুর্দা ও ঠাকুমা ধান-দূর্বা মাথায় দিয়ে বোনকে আশীর্বাদ করে পায়েস খাইয়ে দিলেন। তারপর বড়োরা সবাই। শেষে ছোটোরা। সবাই মিলে 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' গান গেয়ে এবং পায়েস, সন্দেশ ও পাঁপড়ভাজা খেয়ে সেদিনের ছোট্ট অনুষ্ঠান শেষ হলো। খুব আনন্দ হলো।

বিষ্ণু ঘোষ, পঞ্চম শ্রেণী, টিপি রোড, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে	*সঠিক ভাবে সাজাতে হবে*
(১) লা ম লা	(১) তা ব দে র কু ঠা
(২) রা গু দ	(২) র মি তি শী না বি

২২ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) বহিরঙ্গ (২) ভাগ্যবান

২২ জানুয়ারি সংখ্যার উত্তর

(১) বোমারুবিমান (২) ব্যাবসাবাণিজ্য

উত্তরদাতার নাম

(১) অনিন্দিতা রায়, গাজোল মালদা (২) সোমনাথ হাজরা, দুর্গাপুর, পূর্ব বর্ধমান
(৩) রাজশ্রী সাহা, ফরাক্কা, মুর্শিদাবাদ (৪) সোহম সাহা, হুড়া, পুরুলিয়া

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯

ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪

৯০৫১৭২১৪২০

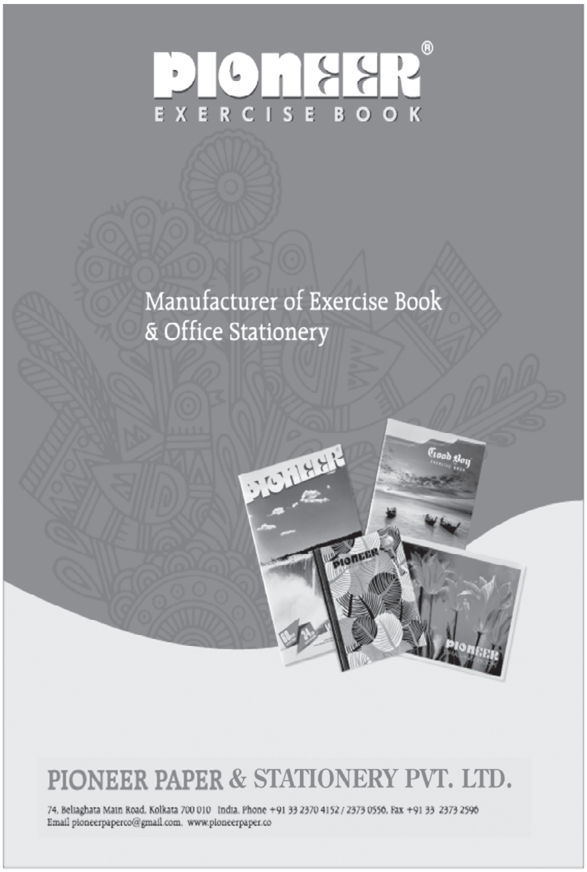

With Best Compliments from -

A

Well wisher

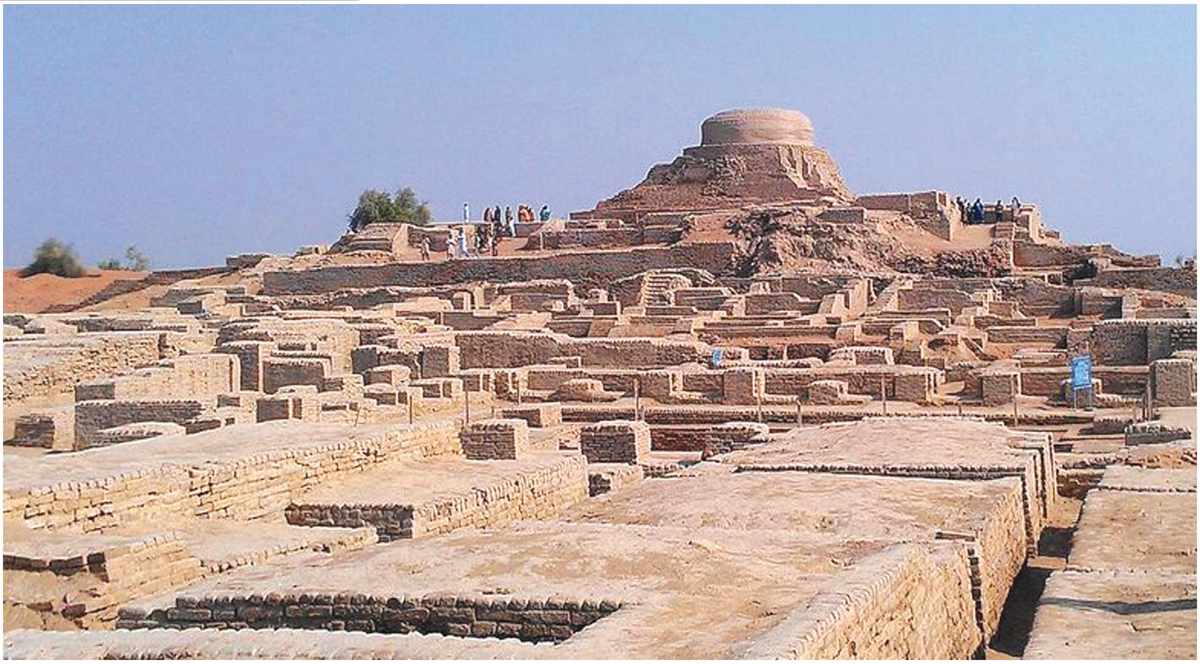

মহেঞ্জোদড়ো কি মৃতের স্তূপ ?

ড. ইন্দ্রজিৎ সরকার

সিন্ধু সভ্যতার অন্যতম আবিষ্কর্তা স্যার জন মার্শাল মহেঞ্জোদড়ো শব্দের অর্থ করেছেন 'মৃতের স্তূপ'। মহেঞ্জোদড়ো সিন্ধু সভ্যতার একটি প্রধান কেন্দ্র। অধুনা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় অবস্থিত মহেঞ্জোদড়ো আজ সিন্ধু সভ্যতার স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এক সময় সেখানে বিশাল নগর ছিল। লক্ষ লক্ষ লোক বাস করত। সেই সময়টি কখন? জন মার্শালের মতে, ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ। কিন্তু বালগঙ্গাধর তিলক জ্যোতির্বিদ্যা অনুযায়ী গণনা করে বলেছেন খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০-৪৫০০ অব্দ। পাশ্চাত্য পণ্ডিত জ্যাকোবি জ্যোতির্বিদ্যা অনুযায়ী গণনা করে তিলকের মতো ওই একই সময় পেয়েছেন। যাক সেকথা। আমাদের আলোচ্য বিষয় মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত সিন্ধু সভ্যতার বয়স নির্ণয় নয়। আমাদের আলোচ্য মহেঞ্জোদড়ো শব্দটির অর্থ কী? জন মার্শাল মহেঞ্জোদড়ো শব্দের অর্থ করেছেন 'মৃতের স্তূপ'। সত্যিই কি তাই? মহেঞ্জোদড়ো কি 'মৃতের স্তূপ'?

আমাদের দেশে একটি প্রবাদ আছে— 'কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন'। ছেলে যদি কানাও হয়, তবু তার নাম রাখা হয় পদ্মলোচন অর্থাৎ কিনা পদ্মের মতো যার চোখ। প্রবাদটি যে ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা আমরা সকলেই জানি। কারণ ব্যঙ্গার্থেই প্রবাদটির প্রয়োগ করি। কিন্তু তবুও এই প্রবাদটির মধ্যে দিয়ে একটি সত্য প্রকাশিত হয়েছে। তাহলো, আমরা কখনো অপ্রিয় সত্যকে প্রকাশ করি না। কানাকে কানা বললে সে মনে কষ্ট পাবে। তাঁকে এই কষ্টটি আমরা দিতে চাই না। এটি আমাদের সমাজের বৈশিষ্ট্য। যদিও কথাটি সত্য; কানা তো কানা-ই। তাহলে যে নগর এক সময় লক্ষ লক্ষ মানুষের বাসভূমি ছিল, সভ্যতার পীঠস্থান ছিল, সেই নগরের নাম কোন হতভাগা রাখলো মহেঞ্জোদড়ো— 'মৃতের স্তূপ'? যিনি এই নাম ওই নগর পত্তনের সময় রেখেছিলেন তিনি কি জ্যোতিষী ছিলেন? তিনি কি দিব্যদৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন এই নগর একদিন 'মৃতের স্তূপ' হবে? তাই যদি হয় তবে তো বিশ্বের সব নগরের নাম মহেঞ্জোদড়ো হওয়া উচিত। কারণ সব নগরই তো একদিন মৃতের স্তূপে পরিণত হবে। ইতিহাস তো এই কথার সাক্ষী। প্রাচীনকালের বহু নগর তো আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তবে তারাও কি 'মহেঞ্জোদড়ো'?

আসলে আমাদের সমাজ, আমাদের ভাষা বিদেশিরা বুঝবেন কী করে? আমাদের পণ্ডিতরাই তো জানেন না। যদি জানতেন তবে তো তখনই মার্শালের ভ্রান্তিটা ঠিক করে দিতেন। এবার বলি মহেঞ্জোদড়ো কথার অর্থ কী? প্রসঙ্গত, আর একটি কথা বলে রাখি। তাহলো, বিদেশি ও স্বদেশি পণ্ডিতরা বলছেন, মহেঞ্জোদড়ো-হরপ্পার সভ্যতা বৈদিক সভ্যতার পূর্ববর্তী এবং তা আর্য সভ্যতা নয়, দ্রাবিড় সভ্যতা। আর্যরা এসে এই সভ্যতার লোকদের নির্বিচারে হত্যা করে এই সভ্যতা ধ্বংস করে এবং সেই সভ্যতা ধ্বংস করে তারা আর্য সভ্যতার বিকাশ সাধন করে। কী সুন্দর সহজ সরল সমাধান! আসলে ইউরোপের লোকেরা তো সারা বিশ্বে এশিয়া-আফ্রিকা-অস্ট্রেলিয়া সর্বত্র এই কর্মটি করেছে--- নির্বিচারে স্থানীয় সভ্যতার

ফ ঃ ৬

মানুষগুলিকে হত্যা করে সেই সভ্যতা ধ্বংস করে সেখানের ভূখণ্ড জবরদস্তি দখল করে তাদের সম্পদ নিজেদের কুক্ষিগত করেছে এবং সারা বিশ্বের সম্পদ লুট করে বিলাসব্যাসনে মত্ত থেকেছে। সুতরাং 'যেমন আধার তেমন বিচার'।

প্রসঙ্গত বলি সিন্ধু সভ্যতা দ্রাবিড়-সভ্যতা নয়; ওই সভ্যতা পুরোপুরি আর্য সভ্যতা। আর আর্যরা বিদেশাগত কোনো জাতি নয়। তারা সৃষ্টির প্রথম থেকেই ভারতের অধিবাসী। আজ পণ্ডিতরা প্রমাণ করেছেন আর্যরা ভারত থেকে সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়েছে। পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ জেন্দ-আবেস্তা পাঠ করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ভারতের আর্যারাই পারস্যে গিয়ে বসবাস করেছে। জেন্দ-আবেস্তার ভাষা তো বৈদিক সংস্কৃতের এক রূপান্তর। তাছাড়া যেখানে বহু ঘটনার উল্লেখ আছে যা পড়লে মনে হয়, পারসিকরা ভারতীয় আর্যদেরই শাখা। পণ্ডিতরা একথাও প্রমাণ করেছেন যে, জেন্দ-আবেস্তা অথর্ব বেদেরই অংশ। জেন্দ-আবেস্তা ও বেদ— এই দুটি গ্রন্থের তত্ত্বগত, গুণগত ও সাধনতত্ত্বের আলোচনা করলে দেখা যায় যে জেন্দ-আবেস্তা অথর্ব বেদেরই লুপ্ত অংশমাত্র। বেদের সেই লুপ্ত ভৃগুবিদ্যা, অথর্বন ঋষি বা ভৃগু ঋষির সেই আলোকোজ্জ্বল উপলব্ধির সারসত্য আমাদেরই পূর্বপুরুষদের একটি শাখা ইরানীয়দের মহাগ্রন্থ জেন্দ-আবেস্তা রূপে বিরাজমান।

বৈদিক বহু শব্দ জেন্দ আবেস্তায় উচ্চারণে সামান্য পরিবর্তন হলেও অর্থের ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন হয়নি। সুতরাং জেন্দ-আবেস্তার উৎস যে বেদ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এবার আসি, মহেঞ্জোদড়ো শব্দের অর্থ বিষয়ে। মহেঞ্জোদড়ো কথার অর্থ মৃতের স্তূপ নয়, মহেঞ্জোদড়ো কথার অর্থ Military Head Quarter। এবার দেখা যাক, কেমনভাবে এই অর্থটি দাঁড়ালো। মহেঞ্জোদড়ো শব্দটিকে সন্ধির নিয়মানুসারে ভাঙলে দাঁড়ায় মহান+ইঞ্জ-দড়ো। সংস্কৃতে ইঞ্জ্ ধাতুর অর্থ নির্দেশ বা সংকেত দেওয়া। আর দড়ো শব্দের অর্থ দুর্গ। তাই মহেঞ্জোদড়ো শব্দের অর্থ সৈন্যদের নির্দেশ দানকারী। অর্থাৎ যে দুর্গ থেকে সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়; এক কথায় Military Head Quarter।

এখন বলুন, মৃতের স্তূপ অর্থটি ঠিক না Military Head Quarter অর্থটি ঠিক। আমরা আমাদেরই প্রিয় কোনো নগরের নাম কি রাখি মৃতের নগর, কিংবা যম-নগর? সন্তানসন্ততিদের নাম কি রাখি যম-যমী কিংবা মরণ কিংবা মৃত্যু? এসব নাম তো আমরা কল্পনাই করতে পারি না। তাহলে কী করে মহেঞ্জোদড়ো কথার অর্থ 'মৃতের স্তূপ' বলব? আমরা কি আমাদের প্রিয় নগরের নাম রাখবো প্রেতপুরী? ছেলে-মেয়েদের নাম রাখব— প্রেত কিংবা প্রেতিনি? এমন নাম রাখা যদি অসম্ভব হয় তবে মহেঞ্জোদড়োর অর্থ যে মৃতের স্তূপ করেছে তাও তো অসম্ভব হবে। মহেঞ্জোদড়োর সভ্যতা যে কত উন্নত ছিল, তা তার ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনে বোঝা যায়। সেখানকার ঘরবাড়ি, জলনিকাশি ব্যবস্থা, স্নানাগার, পয়ঃপ্রণালী সবই আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। আজও আমরা বিস্মিত হই তাদের নগর-পরিকল্পনা দেখে। আর সেই মহেঞ্জোদড়োর অধিবাসীরা কিনা তাদের এমন উন্নত, সুপরিকল্পিত নগরের নাম দেবে 'মৃতের স্তূপ'?

ম হেঞ্জোদড়ো কথাটির অর্থ ও ব্যুৎপত্তি তাহলে দাঁড়ালো এরকম— দৃঢ়, দড়, দড়ো, যার অর্থ দুর্গ। ঋগ্বেদে দেখি, ইন্দ্র বহু পুর (নগর) ভেদ করে সেই সব পুরবাসীদের যুদ্ধে পরাস্ত করে উপাধি পেলেন পুরন্দর। তেমন বহু দুর্গ জয় করেছিলেন বলে উপাধি পেলেন দৃঢ়হা। হন্ ধাতু থেকে 'হা' শব্দজাত একথা সহজেই বোঝা যায়। আর দৃঢ় কথার অর্থ দুর্গ তা আগেই বলেছি। ঋগ্বেদের ৭.২৪.৪ সংখ্যক ঋকে বলা হয়েছে 'ত্বমহি মঘবন দৃঢ়হা' অর্থাৎ তুমিই দুর্গ-নিপাতনকারী মঘবন (ইন্দ্র)। তাহলে ঋগ্বেদে দৃঢ় শব্দের অর্থ পাই দুর্গ। এবার মহেঞ্জোদড়ো কথার অর্থ যে মৃতের স্তূপ নয় তা বোঝা যাবে ঈঞ্জ ধাতুর অর্থটি দেখলে। ঈঞ্জ ধাতুর অর্থ ইঙ্গিত অর্থাৎ নির্দেশ। তাহলে মহা-ঈঞ্জ-দড়ো অর্থাৎ যে দুর্গ থেকে মহাইঙ্গিত বা নির্দেশ দেওয়া হয়। আজকের ভাষায় 'Military Head Quarter।'

প্রসঙ্গত, অনুরূপ কয়েকটি শব্দের অর্থ বিশ্লেষণ করা যাক। সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন প্রাপ্ত আর একটি অঞ্চল চন্হুদড়ো। চন্ শব্দের অর্থ কর্মোদ্দীপন। আর হূ কথার অর্থ আহ্বান করা। আর দড়ো কথার অর্থ দুর্গ। চানহুদড়ো কথার অর্থ তাহলে হবে, কর্মোদ্দীপনের জন্য আহ্বান করা হয় যে দুর্গে। দুর্গ শব্দটি থাকায় বুঝতে অসুবিধা হয় না যে কর্মোদ্দীপন আর কিছুই নয় যুদ্ধ কর্মের জন্য উজ্জীবিত করা, উদ্দীপিত করা। যে দুর্গে সৈন্যদের যুদ্ধের জন্য উদ্দীপিত করা হতো; যুদ্ধের ট্রেনিং দেওয়া হতো।

আরও একটি শব্দের অর্থ দেখুন। 'লহুমঞ্জোদড়ো' এটিও সিন্ধু সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত একটি অঞ্চল। লহু কথার অর্থ ছেদন (বিভাগ) জনিত রস। ঈঞ্জ কথার অর্থ নির্দেশ দেওয়া। আর দড়ো অর্থ দুর্গ। তাহলে যে দুর্গ থেকে যুদ্ধের রসদ পাঠাবার নির্দেশ দেওয়া হতো। আরও সহজ করে বললে যে দুর্গ থেকে সৈন্যদের যুদ্ধের রসদ পাঠানো হতো।

আরও একটি নামগোত্রীয় শব্দের ব্যাখ্যা করা যাক। এই শব্দটিও সিন্ধু সভ্যতার একটি অঞ্চলের নাম। আগে এই স্থানের ভৌগোলিক অবস্থানটি বলি। অঞ্চলটি আরব সাগর তীরবর্তী মাকরণ উপকূলের ইষ্টক-প্রাচীর বেষ্টিত একটি সুরক্ষিত নগর। তবে নগরটি ক্ষুদ্র। সুতকা কথার অর্থ নৌকা। শ্রোতকা, সোতকা, সুতকা। ঈঞ্জ কথার অর্থ নির্দেশ/ইঙ্গিত/সংকেত। দড়ো কথার অর্থ থেকে নৌকা বা জাহাজকে সংকেত (নির্দেশ) দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা হতো।

সুতরাং জন মার্শালকৃত মহেঞ্জোদড়োর অর্থ সর্বৈব ভুল। সাহেব বাবুদের অহংকার যে তারা পণ্ডিত, তাই তারা যা বলবে নতমস্তকে মেনে নিতে হবে। আজও সাহেবদের মোসাহিবরা সাহেবদের ভুলভ্রান্তি মেনে নিলেও সকলে তা মানছেন না। ভারতের বহু পণ্ডিত আজ সাহবদের ভুলগুলিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। ভারতবাসী তাদের স্বাভিমান ফিরে পাচ্ছে। □

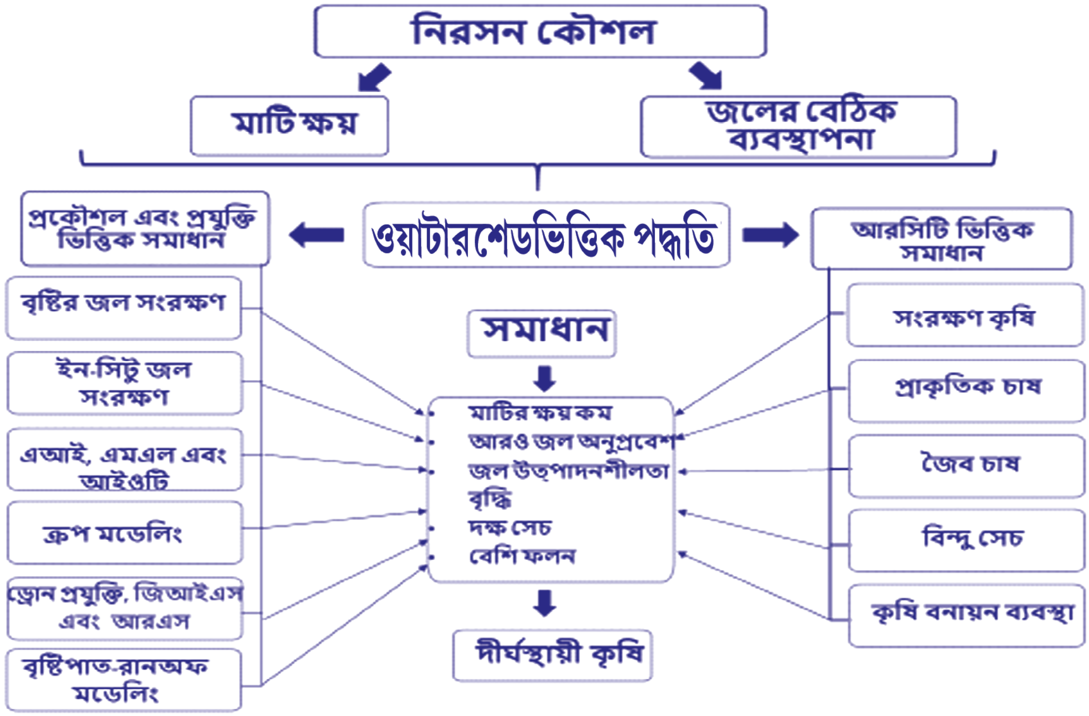

মৃত্তিকা ও জল সংরক্ষণ ঃ উত্তর-পূর্ব ভারতে গ্রামীণ অর্থনীতির রূপান্তর

অনিকেত বৈশ্য

উত্তর-পূর্ব ভারত এক বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অখণ্ড অঞ্চল যেখানে অসম, মেঘালয়, অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড ও ত্রিপুরা এই ৭টি রাজ্য রয়েছে। যাদের এককথায় বলা হয় 'সেভেন সিস্টার্স'। উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রায় ৭৭ শতাংশ ভৌগোলিক এলাকা পাহাড়-পর্বতে ঘেরা এবং মাত্র ১৪.৯ শতাংশ হলো কৃষিজমি (উচ্চভূমি, নিম্নভূমি এবং বর্তমান পতিত এলাকা ধরে)। এছাড়া ৪.৬০ মিলিয়ন হেক্টর (ভৌগোলিক এলাকার ১৮.২ শতাংশ) জমি কোনো না কোনো ভাবে চাষাবাদের উপযুক্ত নয়। এই অনুপযুক্ত জমির মধ্যে ১.৪২ মিলিয়ন হেক্টর জমি মৃত্তিকা ক্ষয়ের দ্বারা প্রভাবিত। যদিও উত্তর-পূর্ব ভারত দেশের মোট জলসম্পদের প্রায় ৪৬ শতাংশ জলসম্পদে সমৃদ্ধ। সেখানকার বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২৪৫০ মিলিমিটার, যেখানে সমগ্র দেশের গড় মাত্র ১১২০ মিলিমিটার।

সীমিত কৃষিজমি, অতিরিক্ত ভূমিক্ষয়ের কারণে এখানে কৃষিজমি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই সঠিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ জরুরি। আমরা যদি জল ও মৃত্তিকা সম্পর্কিত সমস্যাগুলোকে দেখি তাহলে দু'টি প্রাথমিক এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা দেখতে পাই; (১) মৃত্তিকা ক্ষয়, (২) অপরিকল্পিত জলের ব্যবহার।

মৃত্তিকা ক্ষয় ঃ মৃত্তিকা ক্ষয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো জল দ্বারা মৃত্তিকা ক্ষয়। এছাড়া ঝুম চাষ, একই জমিতে বার বার চাষ এবং মাটির চরিত্রের (যেমন– অম্লতা বৃদ্ধি) পরিবর্তনও মৃত্তিকা ক্ষয়ের জন্য দায়ী।

পার্বত্য অঞ্চলে যেহেতু জমির ঢাল অনেক বেশি হয় সেহেতু জলের গতিবেগও অনেক বেশি। বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চলগুলিকে বাদ দিলে বেশিরভাগ জায়গা যেখানে পাহাড়ি ঢালের মাটি খানিক আলগা সেখানে বেশি বৃষ্টি হলেই বৃষ্টির জলের সঙ্গে আলগা মাটি বয়ে নীচে নেমে যায়। এই মাটির ক্ষয় তিনটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হয় (শিট, রিল ও গালি)। এগুলোর মধ্যে ক্ষয় যদি গালি ক্ষয়ে পৌঁছে যায়, তাহলে তা আবার পুরোনো অবস্থাতে ফিরিয়ে আনা খুবই কষ্টকর।

উত্তর-পূর্ব ভারতের উপজাতি জনগোষ্ঠীর ঝুম চাষ হলো একটি মুখ্য জীবিকা। কিন্তু ঝুম চাষের পদ্ধতি গত কয়েক দশক ধরে অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। জনসংখ্যার চাপ ও বৃদ্ধির কারণে এবং সীমিত চাষযোগ্য জমি থেকে খাদ্যের চাহিদা মেটাতে আগে ঝুম চাষ যেখানে ১০ থেকে ১৫ বছরে পুনরাবৃত্তি হতো সেখানে এখন ২ থেকে ৩ বছরের মধ্যে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, যা বাস্তুতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত করতে পারছে না। এই কারণে উর্বর কৃষিজমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং জলের সঙ্গে পুষ্টি বহনকারী উর্বর মাটি ঢাল বরাবর বয়ে যাচ্ছে এবং মৃত্তিকা

ক্ষয় বাড়াচ্ছে। এছাড়াও একই জমিতে অত্যধিক চাষের জন্য এবং অত্যধিক মৃত্তিকা কর্ষণের জন্য দীর্ঘমেয়াদে জমির গড়ন ভেঙে যায় এবং অতিরিক্ত বৃষ্টি হলেই তা বৃষ্টির জলের সঙ্গে বয়ে চলে যায়। উত্তর-পূর্ব ভারতে বনভূমি বেশি হওয়ার কারণে অনেক জমি অম্লিক বা চাষবাসের অনুপযুক্ত।

অপরিকল্পিত জলের ব্যবহার ঃ সঠিক ও পরিকল্পিত জলের ব্যবহারের মতো কঠিন কাজ উত্তর-পূর্ব ভারতে খুব কম। এর কারণগুলি হলো অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি, উঁচু-নীচু পাহাড়ি জমি, মাটির স্বল্প জল শোষণের হার, শীতকালে মাটির মধ্যে চাষযোগ্য জলের ঘাটতি, আধুনিক জলসেচ এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের অভাব।

এই আরসিটির মধ্যে আমরা উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য ব্যবহার করতে পারি সংরক্ষণ কৃষি, প্রাকৃতিক চাষ, জৈব চাষ, কৃষি বনায়ন ব্যবস্থা এবং বিন্দু সেচ ব্যবস্থা। চিত্রে সম্ভাব্য সমাধানের একটি ফ্লোচার্ট দেখানো হয়েছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা কীভাবে প্রযুক্তি এবং আরসিটি-র মেলবন্ধনকে কাজে লাগাতে পারি মৃত্তিকা ক্ষয় কমানোর জন্য। এটি একটি সংরক্ষণ কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার। সোজা ভাষায় সংরক্ষণ কৃষি হলো এমন এক চাষাবাদের প্রযুক্তি যেখানে তিনটি প্রাথমিক শর্ত — শূন্য বা স্বল্প কর্ষণ, মালচিং বা ভূ-আস্তরণ এবং বিভিন্ন ঋতুতে আলাদা শস্য চাষের মাধ্যমে দীর্ঘকালের জন্য পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে চাষাবাদ। তাতে মাটির গঠন ভালো থাকে। এর সঙ্গে মালচিঙের জন্য মাটি

থেকে বাষ্পীভবন কম হয় এবং মাটির অনুকূল তাপমাত্রা বজায় থাকে। জলের পরিমাণও কম লাগে এবং মাটির স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং সুদূরপ্রসারী সময়ে জৈব মালচিং মাটিতে জৈব কার্বনের পরিমাণ বাড়ায়। শস্যাবর্তনের জন্য মাটি ক্ষয়ের প্রবণতা কমে যায়। এর সঙ্গে যদি ক্রপ মডেলিং এবং ড্রোন টেকনোলজিকে ওয়াটারশেডে ব্যবহার করা যায় তাহলে আমাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনাতে সুবিধা হয়। ওয়াটারশেডে থাকা সম্পদের সঠিক ও অনুকূল ব্যবহার করে মৃত্তিকা ক্ষয় কমানো যায় এবং তারসঙ্গে বৈজ্ঞানিকভাবে চাষাবাদ করে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নতি হয়। চিত্রে দেখানো হয়েছে মৃত্তিকা ক্ষয় এবং জলের অব্যবস্থাপনার নিরসন।

সম্ভাব্য সমাধান ঃ বিজ্ঞানীদের মতে উত্তর-পূর্ব ভারতে উল্লিখিত সমস্যাগুলির সমাধান করতে হলে ওয়াটারশেড ভিত্তিক পদ্ধতি হলো অন্যতম একটি উপায়। ওয়াটারশেড হলো এমন একটি জায়গা যার চারিপাশ উঁচু এলাকা দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং এই এলাকাতে যা বৃষ্টিপাত হয় তা একটি মাত্র জায়গা দিয়ে নিষ্কাশিত হয়। ওয়াটারশেড ভিত্তিক পদ্ধতির দ্বারা মৃত্তিকা ক্ষয় এবং অপরিকল্পিত জলের ব্যবহার ও উন্নতি আনতে হলে আমাদের দু'রকম ব্যবস্থাকে (প্রকৌশল-প্রযুক্তিভিত্তিক এবং আরসিটি ভিত্তিক) একসঙ্গে ব্যবহার করে সমস্যার সমাধান করতে হবে। প্রকৌশল-প্রযুক্তিভিত্তিক সমাধানের মধ্যে আমরা ব্যবহার করতে পারি কৃত্রিমভাবে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ, স্বস্থানে জল সংরক্ষণ, ক্রপ মডেলিঙের ব্যবহার, ড্রোন প্রযুক্তি, জিআইএস এবং আরএস প্রয়োগ, রেনফল-রানঅফ মডেলিং ইত্যাদি।

আরসিটির পুরো নাম হলো রিসোর্স কনজারভেশন টেকনোলজি। স্থানীয় এলাকা ভিত্তিক যা সম্পদ আছে তার ব্যবহার করে কৃষিকাজের জন্য প্রযুক্তি বানিয়ে কৃষির উৎপাদন বাড়ানো।

যেহেতু সেখানকার মানুষ কৃষি ও জীবিকার উপর বিরূপ প্রভাবের সঙ্গে লড়াই করছে, তাতে আধুনিক প্রযুক্তির এই একত্রীকরণ আশার আলো দেবে। উদ্ভাবন শক্তিকে কাজে লাগিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে মাটির ক্ষয় কমানোর এবং জল সংরক্ষণের উন্নতি করার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। আনন্দের বিষয় যে, কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রক এ বিষয়ে তাদের চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। □

বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শিক্ষার এক প্রয়োজনীয় গ্রন্থ

বিজয় আঢ্য ॥ ভারতবর্ষের অতীতকে জানতে হলে সংস্কৃত ভাষাকে জানতেই হবে। কেননা ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা— বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র ইত্যাদি সবই সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ভারতের অধিকাংশ ভাষাও সংস্কৃত থেকে উদ্ভূত হয়ে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান রূপে এসেছে। একারণেই সংস্কৃত অনুরাগী মানুষের জন্য পণ্ডিত শ্রীপাদ দামোদর সাতবলেকর (১৮৬৭-১৯৬৮) 'সংস্কৃত স্বয়ং-শিক্ষক' নামে মারাঠি ভাষায় তিন খণ্ডে গ্রন্থটি রচনা করেন। এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্গভাষী সংস্কৃত অনুরাগীদের জন্য শৌনক রায়চৌধুরী গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করেছেন।

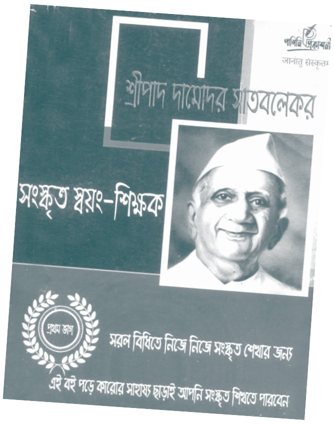

সংস্কৃত লেখার জন্য দেবনাগরী লিপি জানা আবশ্যক না হলেও তা জানলে সংস্কৃতের যে কোনও বই পড়া যাবে। লেখকের অভিজ্ঞতা লব্ধ প্রস্তাব হলো প্রতিদিন এক-আধ ঘণ্টা অভ্যাসেই তা সহজে শেখা যেতে পারে। লেখকের এই দাবি অযৌক্তিক নয়। পাঠ আরম্ভের আগে সংস্কৃত বর্ণমালার বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। যেমন, শুদ্ধ স্বর, সংযুক্ত স্বর, স্বর থেকে অক্ষর (যেমন, ই বা ঈ এবং অ যুক্ত হয়ে য হয়), সংযুক্ত ব্যঞ্জন (যেমন, ক্ ও ষ যুক্ত হয়ে ক্ষ হয়) এবং স্বরসন্ধি।

প্রতিটি অধ্যায় পাঠে প্রথমে কিছু সংস্কৃত শব্দ ও তার অর্থ এবং পরে এইসব শব্দের দ্বারা বাক্য গঠন প্রণালীর উদাহরণ-সহ উল্লেখ করা হয়েছে। পাঠক যাতে সহজে সংস্কৃতে বাক্য গঠন করতে পারে এজন্য প্রায় প্রতিটি অধ্যায়ে শব্দের সপ্তমী বিভক্তিতে একবচনের শব্দরূপ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের পর নিজেই নিজের পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থাপত্র রয়েছে। শুধু তাই নয়, মূলত তিন মাসের এই পাঠক্রমে কীভাবে এই পরীক্ষার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে তার একটি নির্দেশিকা রয়েছে। সব মিলিয়ে বাস্তবিকই গ্রন্থটি সংস্কৃত স্বয়ং-শিক্ষক। অনুবাদক হলেও লেখক যেভাবে গ্রন্থটির বিন্যাস করেছেন তার জন্য সংস্কৃত অনুরাগী শুধু নয়, সকল পাঠকের কাছেই অভিনন্দনের পাত্র। বাকি দুইটি খণ্ডও তিনি অনুবাদের মাধ্যমে আমাদের কাছে পরিবেশণ করলে কৃতজ্ঞ থাকব।

পুস্তক : সংস্কৃত স্বয়ং-শিক্ষক। লেখক : শ্রীপাদ দামোদর সাতবলেকর। অনুবাদক : শৌনক রায়চৌধুরী। পাণিনি প্রকাশনী, কলকাতা। মূল্য : ২৫০ টাকা।

With Best Compliments From -

TODI INVESTORS (INDIA) PVT. LTD.

225D, A. J. C. Bose Road, Kolkata - 700 020

Ph. No. 2302 5161 / 5163

Fax No. 2287 6329

e-mail : todi.india@gmail.com

AUTOMOBILE FINANCER

&

ESTATE DEVELOPERS

দেশের গরিবি হঠাতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর ভূমিকা

শেখর সেনগুপ্ত

আজও এদেশে দারিদ্র্যসীমার নীচে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাই সংখ্যাধিক্যে ধনী ও মধ্যবিত্তদের পিষে দিতে সক্ষম। অপুষ্টি, নিরক্ষরতা, খাদ্যাভাব, বাসস্থানের অপ্রতুলতা ইত্যাকার ভূষণে তাঁরা বিলক্ষণ ভূষিত। মাত্র সাড়ে তিন বছর আগে সরকারি পরিসংখ্যানই জানিয়ে দিয়েছিল, অদ্যপি এ রাজ্যের শতকরা ৫১টি শিশু পুষ্টির অভাবে ধুঁকছে; ৩৬ শতাংশ নাগরিক আধপেটা থেকে দিন কাটায় এবং তাঁদের অধিকাংশই মুখ্যত কর্মহীন। এই পরিস্থিতির হাত থেকে রাজ্যকে

বাঁচাবার জন্য সরকারের পর সরকার যে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, তা কিন্তু নয়। এদেশে সরকারই প্রথম নিয়ে এসেছিলেন Employment Assurance Bill,— যেখানে ক্ষুদ্র ঋণদানকারী (Micro Finance Institution) প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব প্রথমাবধি স্বীকৃত।

এই কাজে সরকারি উদ্যোগের দায় বহন করে থাকে ব্যাংকগুলি। বিশেষত National Bank for Agriculture and Rural Development Bank (NABARD) এবং Small Industries Development Bank of India (SIDBI) —এই দুই ব্যাংকের দায়িত্ব পালনের বহর বৃহৎ থেকে বৃহত্তর হয়ে চলেছে। এরা যা করে এসেছে, তাদের মুখ্যাংশ এইরূপ :

(১) স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে স্বল্প সুদে ঋণ দান।

(২) স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সার্বিক বিকাশের জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে যাওয়া। (আমি নিজে যখন স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার স্টাফ কলেজের ফ্যাকাল্টি ছিলাম, তখন বিভিন্ন কেন্দ্রে/ব্যাংকে গিয়ে আমাকে ওই প্রশিক্ষণ প্রদানের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে)।

(৩) স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলিকে একাগ্রচিত্ত ও একতাবদ্ধ করে তোলায় সহায়তা প্রদান। এই বিষয়ে যথার্থ সক্ষম এনজিওগুলি চিহ্নিত করতে হয় ধারাবাহিক নিরীক্ষণের মাধ্যমে। এসব অনেক সময়ই করে থাকে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলি।

স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী গঠনের কিন্তু কতগুলি শর্ত বা নিয়ম রয়েছে। রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্যও, যা সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা ভালোভাবে যাচাই করে দেখবেন।

- গোষ্ঠীটি রেজিস্টার্ড না হলেও চলবে।
- এক-একটি স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর সদস্য/সদস্যাদের সংখ্যা হবে কমপক্ষে ৮ জন এবং সর্বাধিক ২০ জন।
- প্রত্যেক সদস্য/সদস্যা নিয়মিত ঐক্যবদ্ধভাবে সাধ্যানুসারে সঞ্চয় করে যাবেন। সেই সঞ্চয়ভাণ্ডার থেকে ঋণ নেওয়া যাবে এবং পরিশোধ করতে হবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সুদ সমেত।
- গোষ্ঠীর কর্ণধারগণ নির্বাচিত হবেন সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের দ্বারা।
- সপ্তাহে অন্তত একদিন তাঁরা মিলিত হবেন, মত বিনিময় করবেন, পরিকল্পনার রূপরেখা তৈরি হবে অথবা সংশোধিত হবে। সব গৃহীত সিদ্ধান্তই থাকবে লিখিত আকারে।
- সঞ্চিত অর্থের একটা অংশ থাকবে দলনেতা/নেত্রীর হেপাজতে। বাকিটা কোনও ব্যাংকে। ব্যাংকের পাসবুককে রাখতে হবে মূল্যবান রেকর্ড হিসেবে।
- কয়েক মাস নিজেদের মধ্যে টাকা ধার নেওয়া, পরিশোধ করা সূচি মোতাবেক চলবে এবং এইভাবেই গোষ্ঠী হয়ে উঠবে সুশৃঙ্খল ও নীতিপরায়ণ। গড়ে উঠবে পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি। গোষ্ঠীর খাতাপত্র, রেকর্ড ইত্যাদি পরীক্ষা করে ব্যাংক ঋণও দিয়ে থাকে সেই গোষ্ঠীকে। ঋণের পরিমাণ মোটামুটিভাবে হয়ে থাকে সঞ্চয়ের চারগুণ।

সেই ঋণের টাকায় গোষ্ঠীর সদস্য/সদস্যারা নিজেদের আর্থিক স্বয়ম্ভর করে তুলতে ছোটো ব্যবসা, কুটির শিল্প, পোলট্রি ডেয়ারি, ফিশারি ইত্যাদিতে ব্রতী হতে পারবেন। আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও শ্রমের এমন বেশ কিছু ছবি আজও স্মৃতিতে উজ্জ্বল।

ইত্যাকার পন্থাতেই প্রতিবেশী বাংলাদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ মহম্মদ ইউনুস একদা তাঁর দেশের অবস্থা অনেকটাই পোক্ত করে যেতে সমর্থ হন। এবং তাঁর সেই কৃতিত্বের জন্য নোবেল পুরস্কারও পান।

আজ আমার বয়স আশি পার হয়েছে। তবুও খবরাখবর নিয়ে থাকি। রাজ্যের গ্রামাঞ্চল কিন্তু এমন সুস্থ পরিকল্পনার মাধ্যমে সেই ভাবে আত্মনির্ভর হয়ে উঠেনি এই রাজ্যে। এর জন্য রাজ্য সরকারকে যতটা তৎপর ও সজাগ হয়ে ওঠা দরকার ছিল, তা কিন্তু প্রার্থিত উচ্চতায় পৌঁছায়নি। ব্যক্তিবিশেষের গুণকীর্তন যতটা শুনতে পাই, গ্রামকে স্বাবলম্বী করে তোলার প্রয়াস তেমনটি নজরে আসেই না।

চট্টগ্রামের প্রাচীন তীর্থস্থান সীতাকুণ্ডকে দখলের চেষ্টা

প্রকাশ দাস

প্রাচীন তীর্থস্থানগুলির অন্যতম হলো সীতাকুণ্ড তীর্থ। অবিভক্ত ভারতবর্ষের দক্ষিণের শেষ সীমা অর্থাৎ বঙ্গোপসাগরের শেষ সীমানায় অবস্থিত এই তীর্থধাম। ৫১ শক্তিপীঠের অন্যতম ও শেষ শক্তিপীঠ। দেবীর দক্ষিণ হস্ত সীতাকুণ্ডের নিকট পতিত হয়েছে। দেবী এখানে মা-ভবানী। আর ভৈরব চন্দ্রনাথ। কথিত, ভগবান শিব কলিকালে চন্দ্রনাথ নামে সীতাকুণ্ডে বিরাজিত রয়েছেন। সেখানে ভৈরব মন্দির, ব্যাসকুণ্ড, স্বয়ম্ভুনাথ, বিরূপাক্ষ ও চন্দ্রনাথ ধাম রয়েছে। রয়েছে সীতামন্দির, হনুমান মন্দির, অন্নপূর্ণা মন্দির-সহ অসংখ্য প্রাচীন মন্দির। সীতাকুণ্ডের আগে রয়েছে পবিত্র উষ্ণ প্রস্রবণ। এর পূর্বদিকে রয়েছে ফটিকছড়ি কাঞ্চননাথ (শিব মন্দির) ধাম। কক্সেসবাজার সন্নিকটে মহেশখালিতে রয়েছে আদিনাথ ধাম (শিব মন্দির)। সীতাকুণ্ড, কাঞ্চননাথ ধাম ও আদিনাথ ধামকে মিলিত করে সীতাকুণ্ড স্রাইন কমিটি গঠিত হয়। ওই কমিটি এই তিন ধামের পরিচালনার কাজ করে। ত্রিপুরার রাজা অমরমাণিক্য আজ থেকে ৫০০ বছর আগে নেপালের মিথিলা হতে কয়েকজন ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে সীতাকুণ্ডে নিয়ে আসেন এবং এই ধাম ও ধামের নামে দেবোত্তর সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব প্রদান করেন। ওই ব্রাহ্মণদের অধিকারী নামে অভিহিত করা হয়। এই ধাম পরিচালিত হতো একজন মোহন্ত মহারাজের মাধ্যমে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মোহন্ত মহারাজকে নির্মমভাবে হত্যার পর সেখানে আর কাউকে মোহন্ত করা যায়নি। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী অবিভক্ত বঙ্গের কলকাতা হাইকোর্টের রিট অনুসারে সীতাকুণ্ড স্রাইন কমিটি গঠন ও পরিচালনার বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করে। ২০১১ সালে পুনরায় রিট করে কমিটি গঠনের বিষয়ে কিছুটা রদবদল করা হয়।

১৯৯৩ সালের পর থেকে কয়েকজন ব্যক্তি দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে এই কমিটিকে অধিগ্রহণ করে রাখে। সীতাকুণ্ড স্রাইনের অন্তর্ভুক্ত ১২ হাজার একর জমি রয়েছে। লোককথা অনুসারে চন্দ্রনাথ ধামকে কেন্দ্র করে পাঁচ বর্গকিলোমিটার দেবোত্তর সম্পদ ছিল। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে হিন্দু নির্যাতন, ১৯৯০ ও ২০০১ সালের হিন্দু নির্যাতন ও গণ অত্যাচারের কারণে বহু সম্পদ বেদখল হয়ে যায়। বাদবাকি যে সম্পদ ছিল তা ২৩ বছর

ধরে অধিগ্রহণ করা কমিটির কিছু সদস্য নামে, বেনামে টাকার বিনিময়ে লিজ দিয়েছে এবং ব্যক্তিগত ভাবে লাভবান হয়েছে। বেশিরভাগ সম্পদ মুসলমানরা হস্তগত করে। ২৩ বছর ধরে পরিচালনার পর ২০১৬ সালে কমিটি নবায়ন করা হয়। ওই নবায়নের পর থেকে ২৩ বছরের অনিয়ম বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া হয়। ২৩ বছর কমিটি নবায়নের পর স্রাইন কমিটির ফান্ড শূন্য পাওয়া যায়। শুধুমাত্র সীতাকুণ্ডে দু' লক্ষের বেশি টাকার বিদ্যুৎ বিল বাকি ছিল।

২০২৩ সালের পর এই কমিটির কোনো অডিট বা আর্থিক আয়-ব্যয়ের হিসাবের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। ২০১৬ সালে নতুন কমিটি গঠনের পর ২৩ বছর ধরে জবরদখল করা কমিটির স্বঘোষিত সাধারণ সম্পাদক নিজেকে সাধারণ সম্পাদক দাবি করে হাইকোর্টে রিট করে। ওই রিটের কারণে স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। রিটের নিষ্পত্তি হতে চার বছর সময় লাগে। এই সময়ে দু'জন সাধারণ সম্পাদক থাকার কারণে কমিটির কাজ পুরোপুরি ভাবে স্থবির হয়ে যায়। স্থানীয় অনৈতিক সুবিধাভোগীদের দৌরাত্মের কারণে কোনো উদ্যোগকে সফল করা সম্ভব হয়নি। তবে এই সময়ের মধ্যে আর্থিক দুর্নীতি ও জায়গাজমি বেহাত করার কাজ রোধ করা সম্ভব হয়েছে। আগের সাধারণ সম্পাদক কিছুদিন আগেও পুরনো দলিল ব্যবহার করে সাংবাদিক ইউনিয়ন-সহ বেশ কিছু পক্ষকে জায়গা দান করে দিয়ে নিজেদের প্রাধান্য ধরে রাখার চেষ্টা করে। এই ধামের ৯০ ভাগ দোকান মুসলমানদের। চন্দ্রনাথ ধামে একটা হোটেল রয়েছে যে হোটেলের মালিক এবাদ নামের এক মুসলমান। সেখানে নিরাপত্তার জন্যে পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে। পুলিশদের ৯৫-৯৮ শতাংশ মুসলমান সুতরাং সেখানে বিভিন্ন অভক্ষ্য রান্নাও করা হয়।

এই অনিয়মের মধ্যে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে তীর্থযাত্রীরা ছাড়াও মুসলমান পর্যটকরা ভ্রমণ করে থাকে। আগের ২৩ বছরের অনিয়মের কমিটি সবকিছুকে গোপনে আড়াল করে কাজ করতো। ২০১৬ সাল হতে স্বচ্ছতা আনার চেষ্টা করলে সীতাকুণ্ড স্রাইনের অনিয়মগুলি প্রকাশ্যে চলে আসে। সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপক মাত্রায় প্রচার হতে থাকে। সম্প্রতি সেখানে অতিমাত্রায় হুজুরদের যাওয়া আসা বৃদ্ধি পায়। সেখানে উঠে নামাজ পড়া, ইসলামিক স্লোগান দেওয়া, হিন্দুদের কটাক্ষ করে নানান স্লোগান দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটে। সম্প্রতি চন্দ্রনাথ ধামে গোমাংসের বারবিকিউ পার্টি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর জাতীয় ও স্থানীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে হিন্দুদের ওপর নির্যাতন করা হয়।

এই সময়ে সাম্প্রদায়িক উসকানির প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সীতাকুণ্ডের আওয়ামি লিগের মনোনিত প্রার্থীর এক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। তিনি সীতাকুণ্ডকে পর্যটন কেন্দ্র করার ঘোষণা দেন, কিন্তু কিছু অনলাইন ভিত্তিক পত্রিকা এই উক্তিটাকে কিছুটা পরিবর্তন করে চন্দ্রনাথ ধামকে পর্যটনের আওতায় আনার কথা বলে প্রচার করতে থাকে। সব মিলিয়ে ধাপে ধাপে অনিয়মগুলি ব্যাপক মাত্রায় প্রচারে আসার ফলে হিন্দুদের মধ্যে ভীষণ ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে কিছু যুবক একত্রিত হয়ে মুসলমানদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করে এবং তাদের মধ্যে সংঘাত হয়।

সীতাকুণ্ড স্রাইন কমিটি নতুন করে গঠিত হচ্ছে। জানুয়ারি মধ্যেই গঠন প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। এখন পর্যটকদের ধাপে ধাপে হ্রাস করে সীতাকুণ্ডকে পূর্ণ রূপে তীর্থস্থানে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। আগের কমিটিগুলিতে উচ্চাভিলাষীরা যুক্ত ছিল, নতুন কমিটিকে দীর্ঘ সময় দিয়ে গুছিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। □

এএসআই রিপোর্ট আসার পরই জ্ঞানবাপী হিন্দুদের হস্তান্তরের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ডিসেম্বর মাসে বারাণসী জেলা আদালতে সিল করা খামে জমা পড়ে আর্কিওলজিকাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া (এএসআই)-র সমীক্ষা রিপোর্ট। গত ২৫ জানুয়ারি, বাদী-বিবাদী দুই পক্ষ সমেত সব পিটিশনারকে দেওয়া হয় এই রিপোর্ট। এএসআই তাদের রিপোর্টে জানিয়েছে, বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদের ভেতরে হিন্দুদের দেব-দেবীর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। অর্থাৎ, মন্দিরের অস্তিস্ব ছিল মসজিদের নীচে। এই রিপোর্ট নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছে মুসলিম পক্ষ। তাদের দাবি, এর আগে অ্যাডভোকেট কমিশনের যা পর্যবেক্ষণ ছিল তাতে এএসআই নতুন কিছুই পায়নি। শুধু নতুন করে সমস্ত মাপজোকের বিস্তারিত তথ্য দিয়েছে মাত্র। এই রিপোর্টকে সামনে রেখে মুসলিম পক্ষের কাছে জ্ঞানবাপী হস্তান্তরের দাবি জানালো বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। গত ২৭ জানুয়ারি একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তরফে দাবি করা হয়, এএসআই-এর হাতে যে সমস্ত প্রমাণ এসে পৌঁছেছে, তাতে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে, এটি আসলে একটি হিন্দু মন্দির।

পরিষদের কার্যকরী সভাপতি অলোক কুমার জানিয়েছেন, ১৯৯১ সালে ধর্মীয় উপাসনাস্থল রক্ষা আইন মেনে এই অংশটিকে হিন্দু মন্দির বলে ঘোষণা করা উচিত। এমনকী ইন্তেজামিয়া কমিটিকে পরিষদের তরফে বলা হয়েছে সত্যিটা মেনে নিয়ে তারা যেন সম্মানের সঙ্গে জ্ঞানবাপী হিন্দুদের তথা কাশী বিশ্বনাথ কর্তৃপক্ষকে দিয়ে দেয় এবং অন্য স্থানে মসজিদ বানানোর পরিকল্পনা করে। অলোক কুমার দাবি করেছেন, শান্তিপূর্ণভাবে জ্ঞানবাপী হিন্দুদের হস্তান্তর করলে তা ভারতীয় সম্প্রীতির একটি দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

এএসআই রিপোর্টে বলা হয়েছে, হনুমান, গণেশ ও নন্দীর মতো মূর্তি জ্ঞানবাপীর অন্দরে পাওয়া গিয়েছে। শুধু তাই নয়, অসম্পূর্ণ শিবলিঙ্গের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে যাকে জড়িয়ে রয়েছে একটি সর্প।

কর্ণাটকে হনুমান পতাকা অপসারণ, ১৪৪ ধারা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ গত ২২ জানুয়ারি হতে হনুমান পতাকা উত্তোলন ও অপসারণ নিয়ে ভারতের কর্ণাটকের মাণ্ড্যর কেরাগোড়ু গ্রামে উত্তেজনা বিরাজ করছে। বিষয়টি বিতর্ক, রাজনৈতিক সংঘর্ষ, বিক্ষোভ এবং পুলিশের হস্তক্ষেপ পর্যন্ত গড়িয়েছে। পরিস্থিতির কারণে সেখানে ১৪৪ ধারা জারি করেছে প্রশাসন। সরকারি সূত্র জানিয়েছে, বিজেপি ও জেডি(এস) কর্মীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে পতাকাদণ্ডটি কেরাগোড়ু এবং প্রতিবেশী ১২টি গ্রামের বাসিন্দাদের অর্থায়নে গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমতি নিয়ে স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু ওই দণ্ডে হনুমান পতাকা স্থাপনের অনুমতি দেয়নি পঞ্চায়েত। তারা পতাকা স্থাপনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে কার্যকর্তাদের হনুমান পতাকাটি অপসারণ করতে অনুরোধ করায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ক্ষোভে ফেটে পড়ে গ্রামবাসীরা জানান যে তারা এই পতাকা না সরানোর সিদ্ধান্তে অটল। কয়েকজন ব্যক্তির দ্বারা এই বিষয়টিকে রাজনৈতিক রং দেওয়ার অভিযোগও উঠেছে। বিজেপি, বজরং দল ও জেডি (এস)-এর সদস্যরা পতাকা অপসারণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গ্রামবাসীদের সঙ্গে যোগ দেয়।

গত ২৭ জানুয়ারি গ্রামবাসীরা তাদের দোকান বন্ধ রেখে বিক্ষোভে শামিল হলেন। ২৮ জানুয়ারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা পতাকা সরানোর জন্য গ্রামে গিয়েছিলেন। তখন গ্রামবাসীরা পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে 'গো ব্যাক' স্লোগান দিতে থাকে। বিক্ষোভের সময় স্থানীয় কংগ্রেস বিধায়ক রবি কুমারের ব্যানার ভাঙচুর করা হলে বিতর্ক রাজনৈতিক মোড় নেয়। সংঘর্ষের আশঙ্কায় সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পুলিশ লাঠিচার্জ করে হনুমান পতাকা সরিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে। পতাকা অপসারণের সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন বিজেপি নেতা-কর্মী ও স্থানীয় হিন্দুরা। গত ২৯ জানুয়ারি বেঙ্গালুরুর মাইসুরু ব্যাংক সার্কেলে একটি বিক্ষোভে বিজেপি কর্ণাটকের সমস্ত জেলায় প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। মহাবীর শ্রীহনুমান বজরঙ্গবলীর আপন রাজ্যে তাঁর অবয়ব-অঙ্কিত পতাকা উত্তোলন করতে বাধা দেওয়ার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এক চরম অবক্ষয়ের নজির সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় হিন্দুদের ক্ষোভ, কর্ণাটকে এহেন হিন্দুবিরোধী, ধর্মবিরোধী সরকার নির্বাচন এক পরম পরিতাপের বিষয়।